পরিবর্তন

১৬ ফেবরুয়ারি ১৯৮০





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ সৌম্য ভৌমিক

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


ত্বকের গভীরে
গিয়ে,
সম্পূর্ণ পরিষ্কার
করে
ম্যাক্স ফ্যাক্টর
ক্লীঞ্জিং
কোল্ড ক্রীম
ঘন স্নিগ্ধ ক্রীমে ভরপুর, অথচ হাল্‌কা এই ক্রীম আপনার ত্বক সুন্দরভাবে রক্ষা করে তরতাজা রাখে। এটি ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে দিন শেষের মেক-আপের চিহ্ন, সারাদিনের ধুলো-বালি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করে আপনার ত্বককে কমনীয়, তরতাজা করে রাখার দরুনই ম্যাক্স ফ্যাক্টর কোল্ড ক্রীম আপনার প্রিয়তম সঙ্গী। বিশেষ ফরমূলায় বানানো এই ক্রীম আপনার ত্বককে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে করে আপনাকে করে তোলে লাবণ্যময়ী—অপরূপা।
MAX FACTOR
CLEANSING
COLD CREAM
MADE IN INDIA
ম্যাক্স ফ্যাক্টর
ক্লীঞ্জিং কোল্ড ক্রীম
আপনার ত্বকের সুরক্ষায়
মনোরম সঙ্গী

সম্পাদকীয়

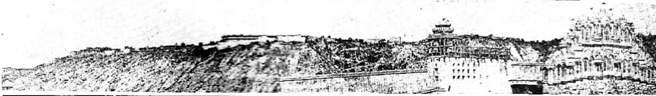
বর্তমান সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের চার প্রান্তের চারটি পৌর শহর—বালুরঘাট, রানাঘাট, শ্রীরামপুর এবং বারুইপুর সম্পর্কে একটি সমীক্ষামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। এই চারটি পৌর শহর পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য পৌর শহরের প্রতিভূ মাত্র। সর্বত্রই অল্পবিস্তর একই হাল—রাস্তাঘাটের জরাজীর্ণ দশা, পয়ঃপ্রণালী অণুবীক্ষণ দিয়ে খুঁজতে হয়, যত্রতত্র বাজার বসে যায়, দুর্গন্ধে শহর ম-ম করে, টাউনহল বা রবীন্দ্রভবন প্রায়শই গুদাম ঘরের সমতুল। এই নিয়েই বছরের পর বছর পৌর শহরের জীবন কেটে যাচ্ছে। কখনো নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পৌরসভা চালাবার ভার পান; কখনো তাদের সরিয়ে দিয়ে একজন প্রশাসককে বসিয়ে দেওয়া হয় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে। অবস্থার তাতে কোনরকম ফের হয় না। সেই দুর্গন্ধ, সেই আবর্জনা, সেই গর্তবহুল রাস্তা, সেই ভিড়ে-ভিড়াক্কার বাজার-হাট—অবস্থা সব আমলেই এক।

কেন পৌর শহরগুলির এ হাল? সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলে একটাই জবাব পাওয়া যাবে: টাকা কোথায়? টাকা না থাকলে কাজ যে হবে না সে তো সবাই জানে। কিন্তু টাকা ঢেলেও কাজ হয় কি? বোধহয় না। পৌরসভাগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির স্থায়ী আস্তানা। টাকা জলের মত খরচ হয়ে যায়; হিসাব থাকে কিংবা থাকেও না কাজ কিন্তু কিছুই হয় না।

কাজের গুরুত্ব বিচারেও অনেক সময় হাস্যকর সিদ্ধান্তের নজির পাওয়া যায়। যে শহরে পৌরসভার নিজস্ব স্টীম রোলারের অভাবে রাস্তা দুরমুশ হয় না, সে শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে হয়ত সুইমিং পুল বানাবার জন্য টাকা মঞ্জুর হতে দেখা যায়। সুইমিং পুল বস্তুটা নিঃসন্দেহে কাজের; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি দরকারী কাজ যে বছরের পর বছর অসম্পন্ন হয়ে পড়ে থাকে!

পৌরসভার আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস বাড়ির উপর ধার্য কর। এই কর আদায়ের ব্যাপারে নানারকমের পুকুরচুরির নজির প্রায় সব পৌরসভাতেই লভ্য। ঠিক মত বন্দোবস্ত করতে পারলে ২০০ টাকার কর ১০ টাকায় নেমে আসে কিংবা পনেরো-কুড়ি বছর আগের হার অপরিবর্তিত থেকে যায়—এমন নজির ভুরিভুরি। যারা ম্যানেজ করতে জানে না, ভোগে তারাই। ফলে পাশাপাশি তিনতলা বাড়ি আর টিনের চালার জন্য একই হারে কর আদায় করা পৌরসভার পক্ষে আদৌ বিচিত্র নয়। এমনটিই চলছে।

কলকাতার দিনে দিনে নাভিঃশ্বাস উঠছে। তার উপর চাপ কমাতে হলে পৌর শহরগুলিকে বাসযোগ্য করে তোলা একান্ত দরকার। তার জন্য চাই বাস্তব পরিকল্পনা, সি এম ডি এ জাতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা, আর চাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্তরিক অভিযান। তা না করতে পারলে পৌর বাজেটের ভস্মে ঘি ঢালাই সার হবে; কাজ কিছুই হবে না।



পরিবর্তন

১৬ ফেবরুয়ারি ১৯৮০, দ্বিতীয় বর্ষ, ষোড়শ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০



সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ

শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ • প্রচ্ছদ আলোকচিত্র : দিলীপ ব্যানারজি

সমীপেষু

মদ্যপান

সোমনাথ চক্রবর্তীর 'মদ্যপান কি অভারতীয়' লেখাটি (১৬ ডিসেমবর ৭৯) তথ্য সমৃদ্ধ কিন্তু প্রত্যয়হীন। মদ্যপায়ীদের দুর্দশা, তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার পরিজনের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় থাকলে এই রকম লেখার সুর বদলে যেতো। সেই সুরটা আলোচ্য লেখায় অনুপস্থিত। তাই দুটি কথা নিবেদন করতে চাই।

প্রাচীন ভারতে মদ্যপান ছিল বলে আজও সে ব্যবস্থা বজায় থাক এটা যুক্তিসিদ্ধ নয়। বরং অনেক মন্দ জিনিসের সঙ্গে মদ্যপান বন্ধ করতে না পারার বেদনা ব্যক্ত হওয়া দরকার। এদেশে নরবলি, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, ডাইনি সন্দেহে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা ইত্যাকার বিস্তর ব্যাপার একদা অনুষ্ঠিত হতো। কালক্রমে মানুষ যখন বুঝেছে এগুলি অকল্যাণ-কর তখন তা বন্ধ হয়েছে। আবার বোঝা সত্ত্বেও নানা কুপ্রথা এখনো চালু রয়েছে। যেমন, বারবনিতা বৃত্তি, অস্পৃশ্যতা, দেবদাসী প্রথা, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, ব্যভিচার, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, মদ্যপান ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য-সংসার-সমাজ সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব-বিষয়ে মদ্যপান সর্বনাশ ডেকে আনে। বিষয়টি অবিতর্কিত সত্যরূপেই গৃহীত হয়েছে। দু-চার জন সীমিত মদ্যপানের সুফল সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার চেষ্টা করে থাকেন বটে, কিন্তু তা তেমন জোরালো কিছু হয়ে ওঠেনি। কেন না অধিকাংশ মদ্যপ পিতামাতার সংসারের দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলা এবং পুত্রকন্যাদের দুর্দশা দেখে চোখের জল রাখতে পারেন এমন মানুষ কম দেখেছি।

শ্রীমধুসূদন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মদ্যাসক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের কাছে মনে হবে মদ্যপান করলেই শিবনাথ শাস্ত্রী বা শ্রীমধুসূদনের ন্যায় মানুষ হওয়া যাবে। ইয়ং বেঙ্গলের একদল তো এমনি ভাবেই শিখেছিল গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানই হলো সত্যিকারের মানুষের মত মানুষ হবার পথ। মদ্যপান করেই নিঃশেষ হলে শিবনাথ শাস্ত্রীকে কি আমরা আজও স্মরণ করতাম? নিশ্চয়ই না। তাকে স্মরণ করি তার কৃতিত্বের জন্য। সে কৃতিত্বের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন মদ্যপান ত্যাগ করার পর। আর কে না জানে যে, অতিরিক্ত মদ্যাসক্তির জন্যই শ্রীমধুসূদন অকালে ঝরে যান। সারাটা জীবন যে তিনি নানা দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন তার জন্য এই মদ্যাসক্তি কম দায়ী নয়।

অমানুষ করে দেবার আয়োজনের সঙ্গে সরকারের সহযোগিতা অমার্জনীয় অপরাধ বলেই মানতে হবে। ইংরেজ তার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সর্বনাশ করেও বহুবিধ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। মদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের উৎস সরকারী কর্তৃত্বাধীন করবার সূচনা এইখানেই। কালক্রমে মানুষের লোভ ও লালসার প্রাবল্যের ফলে মদ্য থেকে সরকারী কোষাগারে বিস্তর অর্থাগম হতে থাকে। তথাকথিত জনকল্যাণকর ও জনসেবার কাজে মদ্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হয়। মদের আয় বন্ধ হলে এখানে টাকার ঘাটতি পড়বে এই আশঙ্কায় নাকি সরকার মদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করে দিতে অনিচ্ছুক। এটা আংশিক সত্য। কেন না মদ্যপানের সুযোগ না থাকলে কয়েক শ' কোটি টাকা যদি ট্যাকস ঘাটতি হয়, তবে কয়েক হাজার কোটি টাকা মদেও তো উড়ে যাবে না। এই টাকাটা প্রধানত ভোগ্যপণ্যে নিয়োজিত হবে। ফলে সে ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়বে। এখানে বিক্রয়কর হিসেবে সরকার কিছু ফেরত পাবেন। অপর দিকে মদ্যপান বন্ধ হবার ফলে রোগ শোক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে, সরকারী সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক কাজের উপর চাপ কমবে। আমাদের তো ধারণা এতে শেষ পর্যন্ত সরকারের আর্থিক সাশ্রয়ই ঘটবে।

মদের কড়ি যোগাতে যাদের ভাতে টান পড়ে তারাই মদ্যপদের আশি শতাংশ। এদের জীবন প্রত্যক্ষভাবে জানা দরকার। মদ্যপানের ফলে কলহ, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের প্রতি তাদের দুর্ব্যবহার, মত্ত অবস্থায় মাতা স্ত্রী কন্যার ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া, জুয়া প্রভৃতি পাপ কাজের প্রতি আকর্ষণ এসব স্বচক্ষে দেখলে আমাদের কর্তাব্যক্তিরা মদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করে দিতে কণামাত্র বিলম্ব করতেন না। এই অভিজ্ঞতা যেমন এদের নেই, তেমনি এরাও মদ্যপ। মদ্যপায়ীদের দ্বারা মদ্য নিষেধ! তা কি কখন হয়? ওরা আমাদের শেখাতে চাইছেন—যত বেশি মদ খাবে ততই বেশি করে আর্তজনের সেবা করা হবে। কেন না যত বেশি মদ বিক্রি হবে ততই সরকারী কোষাগার স্ফীত হবে!

আপনারা যারা সাহিত্য সেবা করেন তারাও অনেকে মাতাল তা আমরা জানি না। তবু অনুরোধ মদের মত একটা সর্বজনীন পাপকর্ম এবং মূর্তিমান অকল্যাণ সম্পর্কে বিভ্রান্তি জাগাবেন না।

কানাইলাল দত্ত, নবব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা

॥ ২ ॥

সোমনাথ চক্রবর্তী "মদ্যপান কি অভারতীয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই আপন কলমে লিখেছেন "...যুগল ইয়ার, বিনীর বাড়িতে বসি খাইতাম বীয়ার।" এটি গিরিশচন্দ্রর রচনা নয় এবং উদ্ধৃতিতেও ভুল আছে। লেখক অমৃতলাল বসু; কাব্যটির নাম "অমৃত মদিরা" মূল চরণ দুটি "আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার, বিনীর বাড়িতে যাই খাইতে বীয়ার।" গুরুদেব অবশ্য গিরিশ ঘোষ।

সুদীপ গুপ্ত, কলকাতা ৭০০০১৯

সাঁইবাবা

১ নভেমবরের পরিবর্তনে 'সাঁইবাবা—একটি অজানা রহস্য' প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র দাসের চিঠির (১ ডিসেমবর সংখ্যা) একটি লাইনে লেখা হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে ভারতের সব মহাপুরুষের নামেই কি তাদের যশের পাশাপাশি কলঙ্ক লেপনের প্রবণতা চলে আসছে না?' আমার মতে শ্রীদাসের এই উক্তিটি সর্বৈব সত্য নয় এবং এই ধরনের উক্তির আগে পর লেখকের আর একবার চিন্তা করা উচিত ছিল।

পুরাকালে চৈতন্যদেব, গুরু নানক, মহাবীর, হজরত মহম্মদ প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও গত শতকের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ প্রভৃতির নামে কেউ কোনদিন কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা করেছে বলে আমার জানা নেই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এই যে সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য যদি ভেলকিবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তাহলে রামকৃষ্ণদেব কোন শক্তির বলে এত মানুষের ভক্তি বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন? আর সাঁইবাবার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, ভগবান মানেই বুঝি বুজরুকি।

যে ম্যাজিক জানে সেই ভগবানের অংশ। ভগবান সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে নির্মল পবিত্র ধারণা তৈরি করার পক্ষে সাঁইবাবার এই সব অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড বাধা স্বরূপ। তবে সাঁইবাবা সম্বন্ধে কামুকতার যে ছবি 'লর্ড অফ দি এয়ার' এ আঁকা হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রীদাস ও আমার বক্তব্য একই।

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা ২৬

[এ সম্পর্কে আর কোন চিঠি প্রকাশিত হবে না—সম্পাদক]

স্টার ফুটবলার

দেবাশিস বন্দোপাধ্যায় ফুটবল মাঠে স্টারেদের নিয়ে যে নিবন্ধটি লিখেছেন (১ ডিসেমবর) তা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। হঠাৎ কলকাতার মাঠে এমন স্টারের গাদাগাদি যে সমস্যা সৃষ্টি করবে তা কেউ কল্পনা করতে পারিনি। অথচ এরা আছেন এবং হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এই সব তথাকথিত আকর্ষণীয় মানুষগুলো ক্রমেই তাদের সম্মান আরও বাড়াতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন, তা যে রকম করেই হোক। এ সবের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আমরা যারা দর্শক তারাও কম দায়ী নই। আমরাই হয়ত হুজুগের বশবর্তী হয়ে এদেরকে স্টার বানিয়ে বসে আছি। প্রচার মাধ্যমগুলোও কিছু কিছু প্লেয়ারকে এমন প্রশংসা করতে শুরু করেন যে তাদেরকে স্টার বানাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

আজকাল সবক্ষেত্রেই প্রায় এ ব্যাপার ঘটে চলেছে। কাউকে বস্ বা কাউকে গুরু বানিয়ে যেমন কাণ্ডটি হয়ে থাকে এখানেও দেখছি তাই হচ্ছে। অথচ যাদেরকে এ সম্মান দেওয়া হচ্ছে তাদের গুণাগুণ কতটা রয়েছে তা বাজিয়ে দেখার ধৈর্য আমাদের নেই। তাই এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন না হলে আমরা বুঝতেই পারব না আমরা কত ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি।

প্রহ্লাদ ঘোষ, কলকাতা ২৯

চাকরি সংরক্ষণ

১ ডিসেমবর পরিবর্তনে 'চাকরি সংরক্ষণ করে অনুন্নতদের কতটা উন্নতি হল' এবং 'তপশিলীদের অনেকে বিশেষ সুযোগের কথা জানেই না।' দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বের বহু দেশে ভারতবর্ষের মত বৃত্তির উপর কাল্পনিক জাতি সৃষ্টির কথা শোনা যায় না। শ্রমজীবী জাতিগুলির ঘৃণা ও অবহেলা সহ উন্নত জীবন যাপনের সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নির্দেশ কোন ধর্ম শাস্ত্রের নামে ধর্মীয় সংবিধানে (সংহিতায়) লিপিবদ্ধ নেই। ভারতবর্ষে তা ছিল এবং এখনও আছে। সুবোধ বালকের মত তা পালন করার লোকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নেই। 'জগৎগুরু' শঙ্করাচার্যের হুঙ্কারে সারা দেশের গুটি কয়েক পত্র-পত্রিকা ছাড়া আর কেউ টুঁ শব্দটি করেনি।

বৃটিশ ভারত (এবং তার পরেও) একটা কথা সবাই শুনেছেন যে, ব্যাকিং না থাকলে কারো চাকরি হওয়ার উপায় নেই। তা ছিল আত্মীয় ও স্বজাতির প্রতি স্বজনপোষণ। মণ্ডল, বিশ্বাস, নস্কর, জানা, পাত্র, সাঁতরা, ঘেড়া, কোঙার, কয়াল, ঢালী, সাপুই, মালি, দাস, হাঁসদা, সরেন, মুর্মু ইত্যাদি উপাধিধারী লোকের কারোর ব্যাকিং ছিল না। তাই চাকরির ক্ষেত্রে তাদের ব্যাকিং হল সংরক্ষণ ব্যবস্থা (বলা বাহুল্য কিছু অনুন্নত জাতি 'ছোটলোক' হয়ে যাবার ভয়ে নিজেদের তালিকাভুক্ত করেননি) এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রদেশে শতকরা সাড়ে বাইশ হতে ৪৬ পর্যন্ত কাগজে কলমে দেখতে পাই। অথচ সারা দেশে ৬/৭ ভাগের বেশি কর্মচারি নিয়োগ হয়নি—উচ্চপদে শতকরা ১ জনও নাকি হয় না। এতেই রব উঠল, তপশীলীরা সব চাকরি নিয়ে গেল? কেন?

আদিবাসী ও তপশীলীরা কি ৮০ ভাগ চাকরি নিয়েছে? মনে করুন দেশে সংরক্ষণ নেই: তা হলে এই লোকগুলির চাকরি পাবার অধিকার নেই?

আসলে সংরক্ষণের জন্য এই তপশীলী বিদ্বেষ নয়—এই বিদ্বেষ ১০০ ভাগ চাকরিই উচ্চশ্রেণীর করায়ত্ত করার মনোবৃত্তির বহিঃ-প্রকাশ। স্বজন পোষণের ঠ্যালায় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ৩২ বছরে ১ লক্ষ ১০ হাজার চাকরি পাওনা আছে সংরক্ষণ হিসাবে। ৩৫০ জনের মধ্যে ২৫ জন এবং ২০০ জনের মধ্যে ২০ জন তপশীলী আদিবাসী কর্মী আছে। এর নাম কি জাত-ভিত্তিক সংরক্ষণ? বহু বিভাগ আছে যেখানে ঝাড়ুদার ও মালী ছাড়া তারা নেই বললেই চলে।

তপশীলী ছাড়াও সংরক্ষণ আছে। পিতার মৃত্যু হলে পুত্রকে চাকরি দিতে হয়। স্বজনপোষণের মাত্রা এখন আরও বেড়ে গেছে। দাসের ছেলের নাম কেটে দিয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তির অ-দাসকে বহাল করে নেওয়া হয়। রেলে ইচ্ছাকৃতভাবে তপশীলী কোটা পূরণ না করে সংবিধান বিরুদ্ধ কাজ হচ্ছে। পরীক্ষা নেবার ৫ বছর পর তপশীলী প্রার্থী নিয়োগ করে মাঝখানে অ-তপশীলী প্রার্থী নিয়ে সিনিয়র বানানো হয়। জাতি বিদ্বেষের বহু দৃষ্টান্ত আছে যার সব উল্লেখ করলে মহাভারত হয়ে যাবে। সুরেন্দ্রমোহন, বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ কলেজ হতে পারে। আম্বেদকর কলেজ হতে পারবে না কেন? কেন আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়-এর জন্য এত বাধা?

অনেকেই তো 'জাত মানি না', তা হলে 'ডাকতার উকিল ইনজিনিয়ার পাত্র চাই' না বলে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈদ্য তিলি পাত্র-পাত্রী চাই বলা হয় কেন?

এত জাতি সমস্যার দেশে স্বজন পোষণ আছে বলেই সংরক্ষণের চিন্তা করতে হয়েছে। চারবার টালবাহানার পর একজন রেলকর্মীর ২৫ বছরে প্রমোশন হয়েছে। তালিকাভুক্ত বলেই তুলে দেয়নি; পরীক্ষা দিতে হয়েছে। 'বিদ্যা, অভিজ্ঞতা না থাকলেও' তালিকাভুক্ত

হলেই পদোন্নতি হয় কথাটা ঠিক নয়। বরং বর্তমানে রেলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মীকে 'বড় কর্তার' কাছে 'অদক্ষ' বানানোর জন্য অযোগ্যতা ও কর্মে গাফিলতির এক চক্রান্ত শুরু হয়েছে। রেলে তপশীলী কোটা সম্পর্কে কথা বলায় উপযুক্ত কর্মীর পদোন্নতি আটকানো হয়েছে। তার নামে 'অযোগ্য' লেখা হয়েছে। যোগ্য-অযোগ্য প্রমাণের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয় না কেন?

যে দেশে একজন তপশীলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েও একটা মূর্তি উন্মোচন করার গঙ্গাজল দিয়ে ধৌত করতে হয় সে দেশে একজন মণ্ডল বা মুর্মু'কে একজাতি এক প্রাণ? ভেবে সময় মত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার জন্য পদোন্নতি ঘটিয়ে দেওয়া হবে এই বিশ্বাস এখনও জাগ্রত হয়নি।

কথা হল জাত-ভিত্তিক সংরক্ষণ যদি আইন বিরুদ্ধ হয় তা হলে তা নাকচ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এক দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম থাকা উচিত নয় বললে কথাটা ঠিক মনে হয় না। কারণ আজও পঞ্জিকায় নির্বর্ণ পদ্ধতি বা পুরোহিত দর্পণে একই হিন্দু জাতির একই ধর্মের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ব্রাহ্মণের ১১ দিনে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ১৩ বা ১৫ দিনে এবং শূদ্রের ৩০ দিনে অশৌচ বর্জন ... ও শ্রাদ্ধের ব্যাপারেও তাই। ... ঠাকুর না হলে রান্না হয় না—... ভোজসভায়ও প্রায় তাই। সুতরাং ... এমন অনেক স্থানেই দেখতে পাই না। আজও সম্প্রদায়গত পুরোহিত ছাড়া চলে না। সর্বক্ষেত্রে পৃথক ব্যবস্থা পৃথক নিয়ম। এইগুলি অনেকের চোখে পড়ে না।

... ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে অনেকেই নীরব ... শুধু ভাসা ভাসা কথাবার্তায় ... এক অদ্ভুত জাতি সমস্যার দেশে 'এক জাতি এক প্রাণ' মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না ... জাত মানসিকতা বিলোপের এক কর্মযজ্ঞ ... তার উপরই নির্ভর করে জাতি ... সংহতি-এর স্থায়িত্ব।

রামকৃষ্ণ বাহাদুর, রবখোলা, শিলিগুড়ি

কালিতীর্থ কালিঘাট

আমার প্রশ্ন উত্তর (পরিবর্তন ১৬ নভেম্বর ২১) উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীসুব্রত রায় মহাশয় অনেক কিছু ভুল করে বসেছেন। রায়বাবু জোর দিয়ে বলেছেন 'Black Zamindar' গোবিন্দরাম মিত্র নিঃসন্দেহে গোবিন্দ দত্ত অপেক্ষা বেশি ঐতিহাসিক। তিনি ... যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এটা সর্বজনস্বীকৃত ... গোবিন্দ মিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। ১৬৯৮ খৃঃ যখন তিন গ্রাম তেরশ টাকায় বিক্রি হয় তাতে গোবিন্দপুর ছিল। রায়বাবু কষ্ট করে A. K. Roy-এর A Short History of Calcutta (Census of India. 1901) দেখে নেবেন। আপনার বিভ্রান্তি দূর হবে বলে মনে হয়। আর একটা প্রশ্ন: দিগ্বিজয় প্রকাশের গোবিন্দ দত্ত লোকস্মৃতির নায়ক একথা বললেন কোন তথ্যের ভিত্তিতে? যদি ধরেও নিই যে ওটা লোকস্মৃতি, কিন্তু যিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি তো ষোড়শ শতকের লোক। তার সময় কিন্তু গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল, এবং সেটা কায়স্থ রাজা প্রতাপাদিত্যের জমিদারির মধ্যে ছিল।

এছাড়া ভবিষ্যপুরাণেও গোবিন্দপুর নাম আছে। আপনি গোবিন্দপুর নামকরণ সম্পর্কে যে দশজন গবেষকের নাম জানতে চেয়েছেন, সেই দশ কেন পনের জনের নাম দিলাম, হয়তো এদের অনেকের নামই আপনি জীবনে শোনেননি! তারা হলেন—১। বসন্তকুমার বসু (কায়স্থ পত্রিকা, কলকাতা খণ্ড, পৃঃ ২০-২১), ২। শ্রীপান্থ (কলকাতা, পৃঃ ৩), ৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (কলকাতা দুই শত বৎসর পূর্বে, পৃঃ ৩০৬), ৪। প্রমথনাথ মল্লিক (কলিকাতা কথা, আদিকাণ্ড, পৃঃ ৭), ৫। প্রভাত গুপ্ত (সেকালের কলকাতা, পৃঃ ২৪), ৬। নগেন্দ্রনাথ শেঠ (কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস, পৃঃ ১২-১৪), ৭। সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় (কালীক্ষেত্র দীপিকা, পৃঃ ১০৬), ৮। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা সেকালে ও একালে পৃঃ ২৩-২৪), ১০। ললিত প্রসাদ দত্ত (কায়স্থ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৬ পৃঃ ২), ১১। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (নব্যভারত পত্রিকা, মাঘ ১৩০৮ পৃঃ ৫০৫-৫০৬), ১২। কেদারনাথ দত্ত (দত্ত বংশমালা, পৃঃ ২২৫-২২৬), ১৩। দেওয়ান কার্তিকের রায় (ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত পৃঃ ২২৫-২২৬), ১৪। মদনমোহন হালদার (বসুক, পৃঃ ১২১-১২২), ১৫। নগেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৯৫)।

সুব্রতবাবু, আপনি মূল প্রবন্ধে (পৃঃ ২৬) বলেছেন, '...বসন্ত রায়ই কালিঘাটের পাকা মন্দিরের প্রথম ভিত্তি স্থাপক।...' আবার বলেছেন যে, পলাশী যুদ্ধের পর হল পাকা মন্দির। তার মানে আপনার বক্তব্য অনুসারে এই দাঁড়াচ্ছে, ষোড়শ শতকে বসন্ত রায় পাকা মন্দিরের ভিত গড়লেন আর অষ্টাদশ শতকে পাকা মন্দির তৈরি হয়। তাই কি? আসলে আপনার ইতিহাস জ্ঞানটাই কম।

কালিপ্রসাদ দত্তের ব্যাপারে প্রথমেই রায়বাবুকে জানাই যে, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় নিজে 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' বইটিকে ইতিহাস বই বলেননি। যদিও বইটি ঐতিহাসিক তথ্যে ঠাসা। বইটির প্রকাশ ১৯১৫ খৃঃ, ঐ বছরের পি এম বাগচির পঞ্জিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি দেখে নেবেন, অথবা নকুল চট্টোপাধ্যায়ের 'তিন শতকের কলকাতা' (পৃঃ ১২২) দেখে নেবেন। অবগতির জন্য জানাই বইটির কিছু ভুল ত্রুটি সংশোধন করে আবার প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। আপনি পি এম বাগচির অফিসে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। ঐ বইখানি অন্য অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহেই আছে। রায়বাবু আপনি আমাকে হরিসাধনবাবুর বইটি দেখতে অনুরোধ করেছেন। শুধু হরিসাধনবাবু কেন আপনার সমর্থনে আমি আরও নয়জন গবেষকের নাম দিলাম—১। প্রমথনাথ মল্লিক (কলিকাতা কথা, আদিকাণ্ড, পৃঃ ২২), ২। হরিহর শেঠ (প্রাচীন কলিকাতার পরিচয়, পৃঃ ৪২২-২৩), ৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃঃ ১৭৪), ৪। রাধারমণ মিত্র (কলকাতার টুকিটাকি, এক্ষণ পত্রিকা), ৫। অবন্তীকুমার সান্যাল (বাবুর বংশ বিচার, এক্ষণ, পৃঃ ১৩), ৬। রাজনারায়ণ বসু (সেকাল আর একাল, পৃঃ ৩৪), ৭। মদনমোহন কুমার (রামদুলাল দে, পৃঃ-৮৩), ৮। মন্মথনাথ ঘোষ (Selection from the writing of Girish Chandra Ghose, পৃঃ ৩৪-৩৫), ৯। সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় (কালীক্ষেত্র দীপিকা, পৃঃ ৯৮)। মাতৃশ্রাদ্ধ না পিতৃশ্রাদ্ধ এ ব্যাপারে authority আমরা কেউ নই ঠিকই। শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলাম না এও ঠিক, কিন্তু যিনি শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত ছিলেন তার উক্তিসহ প্রবন্ধ কলকাতা পুরসংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পুরশ্রী পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংকলনে ছাপা হয়েছে এবং এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত তথ্য ভুল প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং ঐ প্রবন্ধ আপনার না দেখা শুধু অগৌরব নয় এটা আপনার অজ্ঞতা এবং মূর্খতার পরিচয়।

মূর্তি আবিষ্কার সম্পর্কে আপনি ১৩টির অধিক কিংবদন্তী দিতে পারেন বলে জানিয়েছেন। আমার জানা তেরটি কিংবদন্তীর সূত্র উল্লেখ করলাম। এছাড়া আপনার জানা কিংবদন্তীগুলো সূত্রসহ উল্লেখ করলে বাধিত হব। সেগুলি হল—১। সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর 'কালীক্ষেত্র দীপিকা' (পৃঃ ৫৫), ২। W. W. Hunter-এর Statistical Account of Bengal, Vol. I (পৃঃ ১০১), ৩। শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ (যমুনা পত্রিকা অগ্রহায়ণ ১৩১৭ পৃঃ ৩০১), ৪। প্রমথনাথ মল্লিক-এর 'কলিকাতা কথা' (আদি) পৃঃ ১, ৫। নিধুপাল ভট্টাচার্যের 'কালিঘাটের ঐতিহাসিক কথা' পৃঃ ৩৯, ৬। চিত্তপ্রিয় মিত্রের প্রবন্ধ, দৈনিক বসুমতী ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, ৭। প্রাণতোষ ঘটক-এর 'কলকাতার পথঘাট' পৃঃ ২০১, ৮। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়-এর 'পলাশির যুদ্ধ' পৃঃ ৬, ৯। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়-এর 'কলিকাতা সেকালের একালের' পৃঃ ১০৯, ১০। নগেন্দ্রনাথ বসু-এর 'বিশ্বকোষ' (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৩৯৩, ১১। Administration Report of the Suburban Municipality 1872-73, Page 46. ১২। একটি চিঠি যেটি 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' (পৃঃ ৬৪) বইতে ছাপা আছে। ১৩। ১৮৭৬ সালের ৭ আইন অনুযায়ী আলিপুরের কালেকটরির ১৮৮২ সালের ১৭নং মোকদ্দমায় বড়িষার বর্তমান সাবর্ন জমিদারগণের পক্ষের আপত্তির হেতুবাদ। ৪ থেকে ৮ দফা।

কালী কুণ্ডের মাহাত্ম্যের যে তথ্য আপনি আমায় নূতন বলে জানিয়েছেন তা হরিসাধন-বাবুর বই থেকেই বলে মনে হয়, হরিসাধন-বাবু যে বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সেই মূল বই অর্থাৎ ১৮৯১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'কালীক্ষেত্র দীপিকা' আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে এবং বহুপূর্বেই তা আমি (পৃঃ ৯৫) দেখেছি। এ তথ্য আমার কাছে নূতন নয়।

পরিশেষে আপনাকে জানাই শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদার বলেছিলেন—"ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য সত্যের নির্দ্ধারণ। আদালতে বিচারকের ন্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষী, ইহার নিরূপণ করাই তাহার একমাত্র কর্তব্য।" সুতরাং একটি মাত্র বই পড়ে গল্প বলা যায় কিন্তু ইতিহাস লেখা যায় না।

গোপীনাথ দেবনাথ, কলকাতা-৩৭

চলচ্চিত্রের ষাট বছর

১৬ নভেম্বরের 'পরিবর্তনে' বাগীশ্বর ঝার 'বাংলা চলচ্চিত্রের ষাট বছর' পড়লাম। ২৮ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে বলেছেন—'যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলায় অসংখ্য ছবি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরিচালন নৈপুণ্য...সেসব ছবি ছিল অতি নীচু মানের।'

আমি শ্রীঝার এই উক্তির প্রতিবাদ করছি। আমার মনে হয় যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক বাংলা ছবিই তিনি দেখেননি বা সে বিষয়ে বিশেষ খবর রাখেন না। আমার যতদূর মনে পড়ে, নিম্নোক্ত ছায়াছবিগুলি যুদ্ধকালীন (১৯৩৯-৪৫) সময়েই প্রযোজিত ও প্রদর্শিত হয়েছিল:

নন্দিনী, বন্দী, ডাক্তার (নিউ থিয়েটার্স; জ্যোতি প্রকাশ, ভারতী অভিনীত) প্রতিশ্রুতি (নিউ থিয়েটার্স: পাহাড়ী, ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, চন্দ্রাবতী ভারতী অভিনীত), কাশীনাথ (সুনন্দা, অসিতবরণ অভিনীত, খুব সম্ভবত নীতিন বসু পরিচালিত)। উক্ত ছবিগুলির প্রত্যেকটিরই পরিচালনা এবং বিষয়বস্তু অতি নিচুমানের তো নয়ই, বরং অনেকক্ষেত্রে অতি উন্নতমানের। যারা ঐ ছবিগুলি দেখেছেন আমি তাদের মতামত চাইছি। আমি আরো কয়েকটি ছবির নাম করতে পারি। যে ছবিগুলির স্থান নিবন্ধটিতে পাওয়া উচিত ছিল। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'শেষ উত্তর' (বড়ুয়া, কানন, যমুনা অভিনীত) ঐ সময়ের ছবি।

কালিদাস ঘোষ, লামডিং

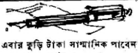
অপসংস্কৃতি

ইদানিং "অপসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি" করে প্রচুর হৈচৈ হচ্ছে। আপনাদের পত্রিকায়ও কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের ভাল মন্দ, সমাজ সচেতনতা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। এভাবে অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতা নিয়ে আলোচনা এবং লেখালেখি করলে সত্যি সত্যিই কিছু উপকার হবে? আমার মনে হয় "না"।

কারণ এভাবে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নাটক, বই বা ফিল্মেরই প্রচার হচ্ছে। আমার এক বন্ধু কলকাতায় গিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট নাটক দেখার জন্য মনস্থির করেছে। অথচ বন্ধুটি মোটেই নাটকের ভক্ত নয়। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত কোন এক পাঠকের পত্র অনুযায়ী আমিও 'মধুরসে পরিপূর্ণ' একটি বই সংগ্রহের চেষ্টা করছি।

আমার মনে হয় সমাজ সচেতন সৃষ্টিকর্তারা নিজেদের বুদ্ধির ধার অনুযায়ী "গণমাধ্যম"গুলি সৃষ্টি করেন। ওরা চিন্তা করেন না যে আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর। সেই জন্য কোন জটিল আলোচনা বা প্রতীক ওদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব সমাজ সচেতনায় ভরা ভাল, শিক্ষামূলক যা কিছু তা সহজভাবে ওদের দিকে লক্ষ রেখেই সৃষ্টি করা উচিত। তা না হলে বুদ্ধিজীবীরা যা সৃষ্টি করবেন তা সমাজের খুবই অল্প সংখ্যক মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা হবে; আর বেশির ভাগ মানুষ 'মধুরস' গ্রহণ করার জন্য বারোমাস মৌচাকের সামনেই ভিড় করবেন। তা দেখে "গেল গেল" রব তুলে গলা থেকে রক্ত বের করলেও কিছু লাভ হবে না।

মৃণাল মণ্ডল, রাণীগঞ্জ



এবার কুড়ি টাকা সাম্মানিক পাবেন
কানাইলাল দত্ত



এক গবেষক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন—সব রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় লজেনস-ওয়ালাদের দেখা যায় না। শোভাযাত্রায় যেসব শ্লোগান দেওয়া হয় তার সঙ্গে লজেনসওয়ালাদের জীবিকার প্রশ্ন জড়িত আছে। শ্লোগান লম্বা হলে তৃষ্ণার বহর বেশি হয়। সেক্ষেত্রে লজেনস বিক্রির সম্ভাবনাও বেশি। কিন্তু শ্লোগান সংক্ষিপ্ত হলে তৃষ্ণা পায় না, লজেনসও বিক্রি হয় না।

যেমন ধরুন, 'মার্কিন' সাম্রাজ্যবাদ, ভারত মহাসাগর থেকে অষ্টম নৌ-বহর সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও'—এ জাতীয় শ্লোগান দশবার চেঁচালেই একটি লজেনস বিক্রির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু 'খতম নয়, শান্তি চাই' জাতীয় সংক্ষিপ্ত শ্লোগান বিশবার চেঁচালেও একটি লজেনসও বিক্রি হয় না।



* * *

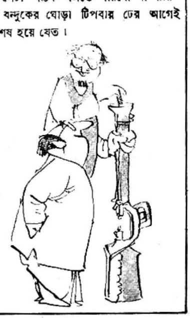
অম্লমধুর

প্রাচীন ঐতিহাসিক বস্তু কেনার সখ ছিল এক জমিদার-নন্দনের। একবার একজন ডিলার তাকে একটা সেকালের বন্দুক দেখালেন। খুব প্রাচীন আমলের জিনিস, বহুযুদ্ধের সাক্ষী। অনেক রাজা মহারাজার হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত ডিলারের হাতে এসেছে। ডিলার বন্দুকটির মহিমা বোঝানোর জন্য সেটার প্রতিটি অংশ খুলে বলতে শুরু করলেন—প্রথমে ধারালো পাথরের টুকরো এই চেমবারে ভরতে হয়, তারপর একটা লোহার ছোট বল রাখবেন এই ব্যারেলে। বাঁদিকে বারুদ ঠেসে দেবেন। বারুদের পিছনে থাকবে তুলো। তার পর র‍্যামরড দিয়ে তুলো আর বারুদ ঠেসে দেবেন আরও সামনের দিকে। তারপর র‍্যামরড যথাস্থানে রেখে চাবি বন্ধ করবেন। আবার খুলবেন, খুলে আরো খানিক লোহার বল আর তুলো ঠাসবেন, তারপর র‍্যামরড দিয়ে ঠেলবেন। তারপর চাবি বন্ধ করবেন।

চণ্ডী লাহিড়ী

—তারপর? তারপর নিশ্চয়ই ঘোড়াটা টিপতে হত?

—সেটা সঠিক বলতে পারবো না স্যার। কারণ বন্দুকের ঘোড়া টিপবার ঢের আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত।



ব্যঙ্গচিত্র : লাহিড়ী

জিনাত ইমরানকে বিয়ে করতে চেয়েছেন

বিশ্বজিৎ ঘোষ

রাজার খেলা ক্রিকেট। আর তাতে সব রাজকীয় কাণ্ড! টেস্ট ক্রিকেট দেখা যেমন প্রেসটিজের ব্যাপার, তেমনি প্রেসটিজ আরও বাড়ে যদি টেস্ট ক্রিকেটারদের সঙ্গে মেশা যায়, তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। টেস্ট তারকারা কি সিনেমা তারকাদের চাইতেও বড়? মনে হয় তাই। তা না হলে সিনেমা তারকারা টেস্ট দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন কেন? তারাও কেন টেস্ট তারকাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে চান?

ক্রিকেট খেলা দেখা বা তাদের সঙ্গে পরিচিত হোন চিত্রতারকারা —এতে আপত্তি নেই। তবে কৌতূহল হয় যাঁদের দেখার জন্য 'দুনিয়া' হুমড়ি খেয়ে পড়ে 'তারাই' আবার টেস্ট তারকাদের পরশ পেতে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকেন। যত গণ্ডগোল এই 'পরশ' পাওয়ার ব্যাপারে। ঘটনা অনেক ঘটেছে। তবে হাল আমলের দুটি ঘটনা ক্রিকেট ও রুপোলী পর্দার জগতে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

একটি কয়েক বছর আগে, অন্যটি এবার। ভেঙ্কটরাঘবন তখন খ্যাতির শীর্ষে। ক্রিকেট-ফর্মে তিনি তুঙ্গে। দারুণ বল করছেন। এক চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়ে তখন নানা কল্পনা। নানা গুজব ও গসিপ। বোধহয় ভারতে সেরা বক্স অফিস তাকে ঘিরে। নানা চিত্রতারকার সঙ্গেই তার প্রেম ও বিয়ের গুজব দারুণ চাউর। অবশেষে আরেকটি গুজব রটে গেল:

অভিনেত্রী হেমা মালিনী বড্ড বেশি মেলামেশা করছেন এক ক্রিকেটারের সঙ্গে। তার সঙ্গে হেমামালিনী ঘন ঘন ডেট দিচ্ছেন। ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল। একবাক্যে সকলে বললেন—হেমা মালিনী বিয়ে করছেন ক্রিকেটার ভেঙ্কটরাঘবনকে। দুজনকে এক সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেত। হেমা ছুটে যেতেন ভেঙ্কটরাঘবনের খেলা দেখতে শুটিং-এর এনগেজমেন্ট বাতিল করে। টেস্ট চলাকালে ভেঙ্কট যে হোটেলে উঠতেন হেমাকেও দেখা যেত সেই হোটেলে। এরই ফলে গুজব সত্যির পর্যায়ে চলে যায়। ধারণা ছিল পতাউদি-শর্মিলার পর আর এক ক্রিকেটার ও অভিনেত্রীতে বিয়ে হচ্ছে। জানি না, কি কারণে হেমা-ভেঙ্কটের বিয়েটা হয়নি। কেন বিয়ে হয়নি গ্যারি সোবার্স আর অঞ্জু মাহেন্দ্রুর মধ্যে তাও অজানা। অজানা রয়ে গেছে রাজা মুখার্জি ও মৌসুমী চ্যাটার্জির বিয়ে না হওয়াটাও।

এবারে একটি ঘটনা নিয়ে সিনেমা ও ক্রিকেট মহলে ঢি ঢি পড়ে গেছে। পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারতে আসার পর থেকে বোমবাইয়ের একদল অভিনেত্রী পাক-ক্রিকেটারদের সঙ্গে বড্ড মেলামেশা শুরু করেন।

বলাবাহুল্য টি, ককটেল, ডিনার সব পার্টির আয়োজন করতে থাকেন ওই অভিনেত্রীরাই। বোমবাই টেস্টের সময় তো পাক ক্রিকেটাররা ওদের নেমন্তন্নের বহর দেখে অবাক। নেমন্তন্ন ছিল নিছক ভদ্রতার। অভিনেত্রীরা মিশেছেনও



ভদ্রতার খাতিরে। পাকিস্তানের এক ক্রিকেটারের সঙ্গে বোমবাইয়ের এক অভিনেত্রীর

এবারে একটি ঘটনা নিয়ে সিনেমা ও ক্রিকেট মহলে ঢি ঢি পড়ে গেছে। পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারতে আসার পর থেকে

কথাবার্তা, মেলামেশাটা কেমন যেন মনে হল। ফাঁক পেলেই এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বেড়ানো এবং বেড়িয়ে অধিকরাত্রে ফেরা ইত্যাদিতে কেমন কেমন মনে হল।

শুধু তাই নয়—শুটিং ইত্যাদির নাম করে ওই অভিনেত্রীকে পাকিস্তান দলের সফরের সঙ্গে সঙ্গে এ শহরে সে শহরে যেতে দেখা যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার অভিনেত্রীটি উঠতেন সেই হোটেলে, যেখানে পাকিস্তান দলও উঠত। ব্যাপারটা যে নেহাতই কাকতালীয় নয়— তা বুঝতে বাকি রইল না। বোমবাইয়ের পর কানপুরেও দেখা গেল সেই অভিনেত্রী গিয়ে হাজির। কানপুরে তো শুটিং ছিল না। তবে কেন তিনি এখানে? উত্তর পাওয়া যায়নি। মাদ্রাজে কেন? শুটিং আছে। আসলে যে ক'দিন তিনি মাদ্রাজে ছিলেন কোনো শুটিং হয়নি একটিও হিন্দি ছবির। মাদ্রাজের পর কলকাতা টেস্ট। পাকিস্তান দল ছিল গ্র্যানড হোটেলে। সেই অভিনেত্রীও উঠলেন ওই গ্র্যানডে। কলকাতায় কিন্তু সেই অভিনেত্রীর কোনো শুটিং ছিল না। তবে কেন কলকাতায়? অন্য কোনো কাজ? না, তাও না। তাহলে?

অভিনেত্রীটি কদাচিৎ গেছেন ক্রিকেটারের রুমে। যেতেন না সম্ভবত সতীর্থ ক্রিকেটাররা ভাল চোখে দেখবেন না বলে। তাছাড়া নানা 'অসুবিধা' আছে। তাই অভিনেত্রীর অনুরোধে ক্রিকেটারটিই যেতেন অভিনেত্রীর রুমে। বেয়ারা থেকে শুরু করে হোটেলের রিসেপশান কাউনটার পর্যন্ত খবরটি পৌঁছে যায়।

জিনাত আমন কলকাতায় এসেছিলেন ইমরান খানের কাছে কথা নিতে—'বলো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা?' ইমরান 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলেননি। কোনো কথা না পেয়ে টেস্টের শুরুর দিন (২৯ জানুয়ারি) জিনাত বোমবাই চলে যান। তবে ১ ফেব্রুয়ারি 'রেসট ডে'-তেও বোমবাই থেকে ইমরান খানের কাছে জরুরী টেলিফোন আসে। ইমরান কি বলেছেন জানা যায়নি। তবে ইমরানের ঘনিষ্ঠ মহল বলেছেন—ইমরান রাজি হননি জিনাতকে বিবি করে ঘরে আনতে। কেন? তা অবশ্য জানা যায়নি। গুজব—জিনাত এখনও হাল ছাড়েননি। টেস্ট চলাকালে ইমরানকে শাদীর প্রস্তাব আরও অনেকে দিয়েছেন। তবে তারা কেউ অভিনেত্রী নন। ★

আলোকচিত্র: অজিত ঘোষ

ব্যাঙ্গালোর ফিল্মোৎসবে তৃতীয় বিশ্বের ছবি তুলে ধরা হল না

বিশেষ প্রতিনিধি

শুরুটাই নোমতা হয়ে গেল। কাপালি ছবিঘরে ঢুকতে গিয়ে প্রথম বাধা এল পুলিশের কাছ থেকে। প্রেস কার্ড দেখে তবে ছাড়পত্র। কয়েক গজ দূরে তখন পুলিশ তার চিরাচরিত কাজে ব্যস্ত। একদল বিক্ষোভকারীকে ঠেঙিয়ে পুলিশের কালো গাড়িতে তোলা হচ্ছে।

উদ্বোধনী সন্ধ্যার প্রধান অতিথি ভারতের সিনেমার প্রথম মহিলা দেবিকারানীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল একদল লোক। তারা নাকি সবাই-ই ব্যাঙ্গালোরের অনতিদূরে একটি ফার্মের কর্মচারী এবং সেই ফার্মের মালিক দেবিকারানী।

পুলিশ কর্ডন ভেঙ্গে ঢোকার মুখে কে একজন হাতে একটা হ্যানডবিল গুঁজে দিয়েছিল। খুলে দেখি তাতে লেখা 'গরীবের রক্তচোষা দেবিকারানীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করার কোন অধিকার নেই---ইত্যাদি।'

একটু পরেই জায়গা সাফ। উৎসুক ভিড় অবশ্যই আছে। সাজানো গোছানো ছবিঘরের সামনে বিক্ষিপ্ত ঢিল, ছেঁড়া ফুলের মালা, কাঁচের টুকরো। সে সব ডিঙিয়েই দেশী-বিদেশী অতিথিরা এলেন। এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হল। রাজ্যপাল গোবিন্দনারায়ণ, দক্ষিণ ভারত ফিলম চেমবারের কর্ণধার, এম ভক্তবৎসল, উৎসব আধিকারিক রঘুনাথ রায়নার বক্তৃতার পর দেবিকারানীও ঝরঝরে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলেন।

ব্যাঙ্গালোরে এই প্রথম আন্তর্জাতিক ফিলমোৎসব। কলকাতার পাওনা দাবিকে পায়ে মাড়িয়ে রাজনৈতিক ফাটকাবাজিতে একদান জিতে দক্ষিণ ভারতের একটি প্রদেশ —বিশেষ করে কর্ণাটক, এই উৎসবকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন ব্যাঙ্গালোর। বহু আগে থেকে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের লাল ফিতের ফাঁস ফাঁসি পরিয়ে দিল কলকাতার গলায়। উপরন্তু কলকাতা তথা পূর্বাঞ্চলের ফিলম ইনডাসট্রির অবহেলা তো ছিলই।

শুনেছি এই উৎসবের খরচখরচার জন্য কর্ণাটক ফিলম চেমবার উৎসব আধিকারিককে তিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছে। এমনকি ব্যাঙ্গালোরের কয়েকটি ছবিঘরের মালিকও মোটা পরিমাণ টাকা নাকি অগ্রিম দিয়েছে ফিলম চেমবারকে। এসব ব্যাপার কি ভাবা যায় কলকাতার ই-আই-এম-পি-এ'র কাছ থেকে? প্রদর্শকদের কুক্ষিগত এই প্রতিষ্ঠান বরং উল্টোটাই করবে বলে আশংকা। সহযোগিতা করাতো দূরে থাক, নানা ভাবে বাধার সৃষ্টি করা হবে এখানে। কলকাতার ছবিঘরের মালিকরা অগ্রিম টাকা দেবেন—এ তো দিবাস্বপ্ন! পরিবেশকরা ভাববেন 'এ কি সব উটকো ঝামেলা! আমার ছবি রিলিজ দু' সপ্তাহ পিছিয়ে যাবে যে!'

উদ্বোধনী সন্ধ্যায় দেখানো হল আইজেনস্টাইনের একদা বিতর্কিত ছবি 'ক্যুই ভিভা মেকসিকো'। তিরিশের দশকে তিনি যখন হলিউড বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন আপটন সিনক্লেয়ারের আর্থিক সাহায্যে সারা মেকসিকো ঘুরে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ছবি তুলেছিলেন। ইচ্ছে ছিল একটা বড়ো ছবি করার। নানা কারণে মতভেদ হওয়ায় আইজেনস্টাইন ছবি অসমাপ্ত রেখেই চলে যান রাশিয়ায়। সম্প্রতি তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী গ্রেগরী আলেকজান্দ্রভ ছেঁড়া-কাটা পুরনো কিছু ফিলম নিয়ে আইজেনস্টাইনের চিত্রনাট্য অনুসরণ করে ছবিটি শেষ করেছেন।

'ক্যুই ভিভা মেকসিকো'র রাশিয়ার বাইরে এই প্রথম প্রদর্শনী। মন্তাজ এফেকট কি যে অসাধারণ, গভীর অর্থ বহন করতে পারে তার জাজ্বল্য প্রমাণ এই ছবির কিছু ফ্রেমিং ও সম্পাদনা। আজকের চাঁই চাঁই পরিচালকদের কাজও মাঝে মাঝে খুবই ছেলেমানুষি মনে হতে পারে এই ছবি দেখার পর। পাথরে মূর্তি, ধূ-ধূ মাঠ, মুখের ক্লোজ-আপ সব কিছুই যেন নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। নিপুণ আঁটোসাটো বাঁধুনি, নাটকীয় ঘটনার সাবলীল চিত্রায়ণ আইজেনস্টাইনের আসল ক্ষমতা। অথচ সেই সহজবোধ্যতা আর সাবলীলভঙ্গির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তার গভীর জীবনবোধ, ধারালো প্রতিবাদের ভঙ্গি ও বিপ্লবী চেতনা।



'কুইনটেট'/আমেরিকা

পরের চোদ্দ দিনে আর কোয়ালিটি ছবির দেখা পাওয়া গেল না। একশ এগারটা ছবির মধ্যে যদি দশ/বারোটা মনে রাখার মত ছবি থাকে তাহলে সেই উৎসবকে কি সফল বলা যায়? সত্যজিৎ রায় অবশ্য বলেছেন বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেই নাকি এমনটি হয়ে থাকে। ভালোর চাইতে বাজে কিংবা মাঝারি ধরনের ছবিই থাকে বেশি।

শুরুতে শোনা গিয়েছিল ফিলমোৎসব '৮০ তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করবে। গত বছর দিল্লির আন্তর্জাতিক উৎসবে মরক্কোর বেন বারকা, সেনিগালের ওসমান সেমবেন ও চিলির মিগুয়েল লিটিন—সবাই একগলায় বলেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশ হয়েও ভারত অন্যান্য দেশগুলোকে অবহেলা করছে। প্রচুর বিরূপ সমালোচনা শোনার পর উৎসব কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিলেন ব্যাঙ্গালোরের ফিলমোৎসবকে তৃতীয় পৃথিবীর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব দিয়ে ভরে তোলা হবে। তা নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো হয়েছিল কম না!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রসব করল এক অশ্বডিম্ব। অজুহাত দেওয়া হল টাকা নেই, ভাঁড়ে মা ভবানী। শুধু আমেরিকান ছবি কিনে ব্যবসা করার অভিসন্ধি থাকলে ভাঁড়ে 'মা ভবানী' আসবেনই। সারা বছর ভারত সরকার যে পরিমাণ ছবি আমদানি করেন তার প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ ইউ-এস-এ'র অফিং ছবি। তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের ছবি আসেই না। অশ্বডিম্ব প্রসব করার প্রকৃত কারণ এটাই। কয়েকটি দেশ সাফ জানিয়ে দিয়েছিল নির্দিষ্ট সংখ্যায় তাদের ছবি না কিনলে তারা উৎসবে ছবি পাঠাবে না। হলোও তাই। এমন কি সুইডেনের মত দেশও একই যুক্তি দেখিয়ে ব্যাঙ্গালোরে অনুপস্থিত থাকলো।

সত্যিই তো, ব্যবসা করা হবে শুধু ইউ-এস-এ, ইউ-কে'র সঙ্গে, আর উৎসবের বেলায় হাত পাতবে অন্যের দরজায়। এটা কোন ধরনের নিরপেক্ষ নীতি?

সেই কারণেই মাত্র নয়টি তৃতীয় পৃথিবীর দেশ ছবি ও প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল



"দি জেডজিন্স সিন"/নেদারল্যাণ্ড



"ম্যারেজ অব দি ম্যারো ব্রাউন"/পশ্চিম জারমানি

ব্যাঙ্গালোরে। এবং অনেকেই পাঠিয়েছে নেহাৎই বন্ধুত্ব ও কূটনৈতিক সম্পর্কের সুতো না ছিঁড়ে ফেলার জন্য। দেশগুলি হল ব্রাজিল, চিলি, কিউবা, ঘানা, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, পাকিস্তান আর সিংহল। ন'টির মধ্যে ফিলমী ঐতিহ্য আছে মাত্র কিউবা, চিলি ও ব্রাজিলের। অন্যান্যদের উপস্থিতি নেহাৎই সৌজন্যমূলক।

ব্রাজিলের পাঠানো চারটি ছবির মধ্যে বয়সে দুটো পুরনো, দুটো নতুন। অথচ প্রত্যেকটিই আমাদের কাছে নতুন। নেলসন পেরিয়েরা দ্য সান্তোস ও র‍্যু গুরেরার ছবি দুটোকে প্রতিবাদী ছবি বলা যায়। 'ব্যারেন লাইভস' ও 'দি গানস' ব্রাজিলের ভেঙে পড়া অর্থনীতির ওপর বাস্তবনিষ্ঠ ডকুমেন্টেশন। লুইস রোজেমবার্গের 'ডায়েরি অফ অ্যান ইনডাসট্রিয়ালিসট' এক বিপ্লবী ছাত্রের ধনবান বুর্জোয়া হয়ে যাওয়া এবং তারই কথায় বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয়িষ্ণু দিকটাকে তুলে ধরা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক সাফল্য কোন পটপরিবর্তন ঘটায় না, বরং সে-ই ঐ ব্যবস্থার শিকার হয়ে পড়ে। ছবিটিতে অসংখ্য প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলির মর্মোদ্ধার প্রায় অসম্ভব। নগ্ন নারী মূর্তিটি ব্রাজিল দেশের প্রতীক। সে নিজেই যেন বন্দুকটি তুলে দেয় শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ মালিকের হাতে।

ইপোজুকা পন্তিসের 'দি রিটার্ণ অফ দি প্রোডিগাল সন' দেখে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'র কথা মনে পড়ছিল। গ্রামের এক তরুণ শহরে আসে ভাগ্যান্বেষণে, বিফল হয়ে ফিরে যেতে হয় মৃত্যুবরণ করতে। এবং শেষ দৃশ্যে দেখা যায় আরেক যুবক আসছে একই উদ্দেশ্যে শহরে। ছবির ট্রিটমেন্টে কোন অভিনবত্ব নেই, কিন্তু বক্তব্য গভীর।

চিলির দুটো ছবির মধ্যে মিগুয়েল লিটিনের 'জ্যাকল অফ ন্যাহলতরু' যে কোন শাসন ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের ওপর একটি দারুণ স্যাটায়ারধর্মী ছবি। খিদের জ্বালায় একটি পরিবারের পাঁচজনকে খুন করার অপরাধে খুনীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। কিন্তু আইনানুগ সেই খুনের প্রতি বিদ্রূপ ভঙ্গিটাই ছবির মূল বিষয়।

'জুলিও স্টার্টস ইন জুলাই' তেমন উল্লেখযোগ্য ছবি নয়। নিছক হালকা চরিত্রের সেকস কমেডি। চিলির রাজনৈতিক ওঠা-পড়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগও নেই। অকিঞ্চিৎকর।

কিউবার দুটো ছবির মধ্যে টমাস আলেয়ার 'দি সারভাইভরস' অবশ্যই উৎসবের একটা উল্লেখযোগ্য ছবি। বিপ্লবের পর বুর্জোয়া ভ্যালু ও ব্যবস্থার পতনকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। আলেয়ার ভঙ্গি এই ছবিতে হিউমার ঘেঁষা। একটি বুর্জোয়া পরিবারের ধ্বংসকে কেন্দ্র করে তিনি বাঞ্ছিত বক্তব্যে উপস্থিত। ম্যানুয়েল অকেটাভিও গোমেজের 'এ ম্যান, এ ওম্যান, এ সিটি'কে প্রচারধর্মী ছবি ছাড়া অন্য, কিছু বলা যায় না। তবে বাঁধুনীতে মুনসিয়ানা আছে। প্রচারকর্ম কখনই ছবির নাটককে ডিঙিয়ে যায়নি।

মরক্কোর 'আলেয়ম আলেয়ম' প্রতিবাদী নয়, জেদী ছবি বলতে পারি! গ্রামের এক তরুণ চাষীর ছেলে গভীর আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের ফসল হিসাবে কিভাবে সব বাধা জয় করে স্বপ্নের জীবনকে বাস্তবরূপ দিল তারই ডকুমেন্টেশন। ছবিটি ম্যানহাইম উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছে। পরিচালক আহমেদ মানের্টান 'সিনেমা ভেরিৎ' স্টাইলে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরেছেন, গ্রাম জীবনের ছোট ছোট ছবিগুলো তাই বিশ্বস্ত রূপ পেয়েছে।

ঘানার ছবি 'জেনেসিস চ্যাপটার-১০' মনে রাখার মত নয়, নাটক—অতিনাটক ঘিরে আছে ছবিটাকে। সম্ভবত সাফল্যের কথা চিন্তা করেই পরিচালক টম রিবিয়েরো এমনটি করেছেন। উপনিবেশবাদী চিন্তার ফসল এই ছবি।

তুলনায় হংকং-এর ছবি দুটোই অনেক বেশি আধুনিক। 'কিং-হু' আন্তর্জাতিক খ্যাত পরিচালক। সাং ও মিং রাজত্বের সময়ে ক্ষমতার দখল নিয়ে যে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেছিল কোরিয়ায়, তাই নিয়ে 'লিজেন্ড অফ দ্য মাউনটেন' ও 'রেইনিং ইন দ্য মাউনটেন' ছবি তৈরি হয়েছে। মার্শাল আর্ট, তরোয়াল খেলার বাহারি চমক আছে, কিন্তু তার গভীরে রয়েছে স্বার্থান্ধ পুরুতদের অধার্মিক কাজকর্মের ফিরিস্তি। এবং ইতিহাসের পুরনো পাতায় রাজনীতি ধর্মনীতির শোষণের খোলসটাকে তিনি তুলে ফেলেছেন।

ইন্দোনেশিয়া (ব্যালাড অফ এ ডেলি মিসট্রেস) ও পাকিস্তানের (জিন্দগী) ছবি দুটো দেখা হয়নি। শুনেছি নিতান্তই ছেলে-ভোলানো ছবি।

তৃতীয় পৃথিবীর আরও সব উল্লেখযোগ্য দেশগুলো ছবি পাঠাল না প্রতিবাদ জানিয়ে। বেশির ভাগ প্রতিবাদী ছবিগুলো সরাসরি সেই দেশ থেকেও আসেনি—এসেছে লনডনের এক পরিবেশকের কাছ থেকে। আগামী উৎসবে ভারত সরকার ও উৎসব কর্তৃপক্ষ ছবি আমদানির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেন তারই ওপর নির্ভর করবে বলিভিয়া, ইস্রায়েল, ইরাক, প্যালেস্টাইন, লেবানন, সেনেগাল, উরুগুয়ে, পেরু, পানামা, মেকসিকো, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের ছবি পাঠানো।

তবে আশাপ্রদ কোন বক্তব্যও পাওয়া যায়নি ব্যাঙ্গালোরে।

এই তৃতীয় বিশ্বের ছবির কথা বাদ দিলে অন্যান্য দেশের মধ্যে ক'টা আর ভালো ছবি পাওয়া গেছে? পাঁচ/সাতটি ছবিকে আন্তর্জাতিক মানের মনে হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া-কানাডা-আমেরিকার তিনটে ছবি প্রথম দিন দেখার পর ধারণা ছিল অন্য। আস্তে আস্তে আশা



'প্রাইভেট্স্'/সম্রাজ্যে

মিলিয়ে গেল শূন্যে।

লোরদান জাফরোভনিকের 'অক্যুপেশন ইন ২৬ পিকচার্স' (যুগোশ্লাভিয়া) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুর প্রেক্ষিতে একটি অসাধারণ ছবি। বন্ধুত্বের কাঠগড়ায় রাজনীতিকে দাঁড় করিয়ে তিনি একটি নির্মম নিষ্ঠুর বাস্তবকে পর্দায় তুলেছেন। এবং ছবির প্রসাদগুণটি বড় মন ভোলানো। থিম মিউজিক হিসাবে যে গানটি ব্যবহার করা হয়েছে তার সুর ও কথা বড় মর্মভেদী।

পরের ছবি ছিল কানাডার 'স্ক্রিম ফ্রম সাইলেনস'। উৎসবের অন্যতম সেরা ছবি, বলা যায় এটিকে। ধর্ষিত হবার পর একটি মেয়ের মানসিক অবস্থাকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ছবিতে। পরিচালক অ্যানি ক্লেয়ার পোইরের-এর গল্প বলা এবং বিশ্লেষণ ভঙ্গিটাও বড় মনোহারী। ফিল্মের ভেতর ফিল্ম করার পদ্ধতিতে তিনি চিত্রনাট্যের অঙ্গ করে তুলেছেন। মেয়েটির মানসিক যন্ত্রণা, অপরাধবোধ, আত্মগ্লানি শুধু প্রকাশই পায়নি, পরিচালকের মন্তব্যও প্রকাশ পেয়েছে। সম্পাদকের টেবিলে বসে ছবিটি নিয়ে দু'জনে আলোচনা করেছেন। একাধিক ধর্ষিতা মহিলার সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষও চরিত্রটির বিশ্লেষণে সাহায্য করেছে।

ল্যুই মালের 'প্রেটি বেবি' আবার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের ছবি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে নিউ অরলিঁর এক বেশ্যালয় ছবির ঘটনার জায়গা। ভায়োলেট নামে কিশোরী ঐ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে। বেশ্যালয়ের সব নিয়মকানুন আচার-আচরণে সে তখন থেকেই অভ্যস্ত। মা-মাসি স্থানীয় সবাইকেই সে পরপুরুষের সঙ্গে দেখে। এসব জীবনের অঙ্গ হিসাবে ধরে নিয়ে সে বড় হচ্ছে। এবং বারো বছর বয়স হলে তাকে বাজারে ছাড়ার জন্য নীলাম ডাকা হয় একদিন। এক প্রৌঢ় সেই ডাক জেতেন। পুরুষের সঙ্গে প্রথম রাত কাটাতে সে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়, হয়ও না। স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে যায় সব কিছু। কিন্তু হঠাৎ সে প্রেমে পড়ে এক ফটোগ্রাফারের যে ওর মা'র ছবি তুলতে এসেছিল। একদিন মা একজনকে বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে ভায়োলেটও এসে আশ্রয় নেয় তার প্রেমিকের কাছে। দুজনের কাছেই ব্যাপারটা থাকে ছেলেখেলার পর্যায়ে। সবশেষে মা একদিন এসে মেয়েকে নিয়ে যায় লেখাপড়া শেখাতে। ভায়োলেট কিছুতেই যাবে না, সে তখন অভিজ্ঞতার ছোঁয়ায় 'নারী' হয়ে উঠতে চাইছে। ল্যুই মাল পরিবেশের সঙ্গে কিশোরী মেয়েটির মানসিকতাকে একাত্ম করে দিয়েছেন। চিত্রনাট্যে ঐ সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাটাও স্থান পেয়েছে। যদিও তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ভায়োলেট ও তার পরিবেশ। তাকে হাত ভরে সাহায্য করেছেন চিত্রগ্রাহক স্ভেন নিকভিস্ট আর কিশোরী শিল্পী সুসান শ্যার্ডন।

ফিল্মোৎসবে আমেরিকান ছবির সংখ্যা ছিল কুড়ি। সংখ্যায় বেশি বলেই ভালো ছবির সংখ্যাও ছিল বেশি। পল স্ক্রাডের 'হার্ডকোর' আজকের আমেরিকান সমাজে বেপথু ছেলেমেয়েদের সমস্যাকে নিয়ে তোলা। ওখানকার পর্নো-আনডারওয়ার্ল্ডের এক চিলতে সমাজকে তিনি দেখিয়েছেন। ভয়ানক ধর্মভীরু এক ব্যবসায়ীর তরুণী মেয়ে নিখোঁজ হতে বাবাকে এসে পড়তে হয় ঐ নারকারজনক পরিবেশে।

মার্টিন স্করসেসের 'লাস্ট ওয়ালৎজ' ও 'নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক'—দুটো ছবিই সংগীত-বহুল। দ্বিতীয় ছবিটিতে প্রধান দুই চরিত্র নায়ক-গায়কের সম্পর্কটাকে অর্থনৈতিক সাফল্য-অসাফল্যের প্রেক্ষিতে রেখে এক ধরনের পিরিয়ড পিসের রূপ দিয়েছেন। রবার্ট ডি নিরো ও লিজা মিনেল্লি অভিনয় করেছেন দারুণ। গানের অংশটাও আকর্ষণীয়।

মার্টিন রিটের 'নর্মা রে' একেবারে অন্য ধরনের ছবি। আমেরিকার কাপড় কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের প্রথম ইউনিয়ন তৈরির গল্প। নিউ ইয়র্ক থেকে এক তরুণ রুবেন এসে ইউনিয়ন তৈরির পরিকল্পনা দিলে প্রথমটায় মালিক-শ্রমিক দু' পক্ষ থেকেই বাধা আসে। কিন্তু নর্মা রে নামের এক তরুণী শ্রমিক আসে এগিয়ে এবং তারই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি হয়। রুবেনের সঙ্গে নর্মা'র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও সে স্বামী সোনির সঙ্গে থেকে যায়। রুবেন চলে যায় নতুন জায়গায়, নতুন কারখানায়। পরিচালক রিট নর্মার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কর্মজীবনের ওঠাপড়া ও আন্দোলনকে সুন্দরভাবে সমান্তরাল টেনেছেন। প্রধান চরিত্রের শিল্পী শেলি ফিলডের কান উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পাওয়া অবশ্যই সঙ্গত।

জেমস ব্রিজেসের 'দি চায়না সাইনোড্রোম' একটি অসাধারণ সংবাদধর্মী ছবি। এক টি-ভি রিপোর্টার ও তার ফটোগ্রাফার লুকিয়ে লুকিয়ে একটি পাওয়ার প্ল্যানটের নানা কাজ-কর্মের ছবি তুলেছিল এবং তাই নিয়ে শুরু হয় বিরোধ। ঘটনার নাট্যমুহূর্তগুলো অসাধারণ দক্ষতায়, বিন্যাস নৈপুণ্যে হাজির করেছেন। উডি অ্যালেনের 'ইনটিরিয়রস', রবার্ট অল্টম্যানের 'থ্রি ওম্যান' ও 'কুইনটেট' নিঃসন্দেহে উৎসবের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

গত বছর বার্লিন উৎসবের সোনার ভল্লুকটা দেওয়া হয়েছিল স্পেনের ফিল্ম ইনডাসট্রিকে। সেই স্পেনের একমাত্র ছবি 'কোম্প্যানিস প্রসিডিং এগেনসট ক্যাতুলিনা' আমাদের ভাল লাগেনি। স্পেনের সুনাম বজায় রাখতে পারেনি। যদিও ছবিটির বিষয় ছিল রাজনীতি, কিন্তু পরিচালকের (যোশেফ মরিয়া ফন কোল্ডা) মুন্সিয়ানা ও ক্ষমতার অভাব বড় চোখে পড়েছে। অথচ গতবছর এই দেশ থেকেই 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' এর মত অসাধারণ ছবি পেয়েছিলাম। জাইমে ক্যামিনোর ছবিই বা এলো না কেন?

সুইজারল্যানডের বিখ্যাত পরিচালক অ্যালা ট্যানারের 'মেসিডোর' আশানুরূপ না হলেও নিঃসন্দেহে ভাল ছবি। দুই ভবঘুরে তরুণীর জীবন সন্ধানের গল্প। উদ্দেশ্যহীন দীর্ঘ যাত্রায় তারা বুঝতে পারে জীবনের মূল্য উদ্দেশ্যহীনতায় নয়। এক সময় কানাকড়ি-শূন্য হয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাদের এক সরল নিরপরাধ লোককে খুন করতে হয় এবং ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে। দুজনেরই মনে তখন ক্ষোভ। ট্যানারের বিশ্লেষণ ভঙ্গি রিপোর্টাজ ধরনের।

ইভ ইয়েরসিনের 'লিটিল এস্কেপ' এক বৃদ্ধের স্বপ্নের গল্প। বুড়ো বয়সে একটা মোটর সাইকেল কিনে সে স্বপ্ন দেখে আল্পসের চূড়োয় উঠবে। একটা ফার্মে সে কাজ করে। সেই ফার্মের মালিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে তার সম্পর্ককে ঘিরে একটা ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি করেছেন পরিচালক। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, যান্ত্রিকতা আসছে। পুরনো প্রথা বিদায় নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই বৃদ্ধের আর আল্পসে যাওয়া হল না। ছাঁটাই হল সে। মালিকের ছেলে ব্যাংকের কাছে জমি বন্ধক

দিয়ে নতুন কিছু করার কথা ভাবল। মালিকের মেয়ে চলে গেল অন্য কোথাও। তার ইতালিয় প্রেমিক ফার্মের কর্মচারী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। তার ভাগ্য দোদুল্যমান। ছবির অন্তিমপর্বটি বড় ব্যঞ্জনাময়।

পোল্যানড পাঠিয়েছিল তিনটি ছবি। ওয়াজদার দুখানি ছবিই ছিল কেজোর্কি। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'দি মেইডস অফ উইলকো' কিংবা 'রাফ ট্রিটমেন্ট' তার প্রতিভার পরিচয় দেয়নি। ছবিগুলোর পরিবেশ ও সময়ের সঙ্গে পরিচিত নই বলেই বুঝি এমনটি ঘটলো। ক্রিস্তফ কিসলোওস্কির 'ক্যামেরা বাফ' বেশ মজার ছবি। নিতান্তই শখ মেটানোর জন্য একটা ক্যামেরা কেনার পর ধীরে ধীরে ছবির নায়ক কিভাবে ছবি তোলায় আগ্রহী হয়ে পড়ল তাই নিয়ে গল্প। এবং এই ছবি তোলার নেশাতেই বিরোধ শুরু হল বৌ-এর সঙ্গে পরিচালক কিসলওস্কি ফিলমের নেশাকে প্রধান চরিত্রের মাধ্যমে এক ধরনের উন্মাদনায় রূপান্তরিত করেছেন। উপভোগ্য।

নেদারল্যানডের চারটি ছবির মধ্যে রেনে ডন নিয়ের 'দি ডেডলি সিন' সবচাইতে বুদ্ধিদীপ্ত ছবি। একজন অভিনেতার স্মৃতি চারণার মধ্য দিয়ে তার ছোটবেলা, যৌবন কালকে ধরার চেষ্টা রয়েছে। ওর দ্বিতীয় ছবি 'সাইলেনট লভ' একটি মিষ্টি ছবি। বাবা-ছেলের মধ্যে সুমধুর সম্পর্কটা নিয়ে তিনি একটি অ্যাডভেঞ্চার ধর্মী ছবি করেছেন, সেই সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দিকটাতেও আলো ফেলেছেন।

জিওফ স্টিভেনের (নিউজিল্যানড) 'স্কিন ডিপ' খুবই সাধারণ স্তরের ছবি। নরওয়ের তিনটি ছবিই আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে। 'নেক্সট অফ কিন' 'দি সাইলেনট মেজরিটি' দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি বলতে দ্বিধা নেই। একটু ব্যতিক্রম 'সেজ হু···?' পরিচালক পিটার ভেনোর্ড আধুনিক বিজ্ঞানকে বিদ্রুপ করেছেন।

হাঙ্গেরির ছখানি ছবিই এসেছিল প্রতিষ্ঠিত পরিচালকদের কাছ থেকে। ইস্তভান গাল শহরে স্বশরীরে হাজির ছিলেন চারটি ছবি নিয়ে। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তার প্রতিটি ছবিরই বিষয় ছিল বিপর্যস্ত হাঙ্গেরি, অতীত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বাবার স্মৃতি ইত্যাদি। তবে 'ডেড ল্যানডস্কেপ' আমাদের একবারে হতবাক করে দিয়েছে। প্রায় জনশূন্য একটি গ্রামে এক দম্পতির বাস। দুজনের পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি গভীর পরনির্ভরতাকে নিয়ে কাব্যময় রূপ দিয়েছেন পরিচালক। হাঙ্গেরির এক নম্বর পরিচালক মিকলোস জাঁকসো আমাদের নতুন করে ভাবনায় ফেলতে পারেননি। আগেকার ছবিগুলোর মত তিনি এবারের ছবি দুটোতেও (হাঙ্গেরিয়ান র‍্যাপসডি ১ ও ২) গান, নাচের সাহায্যে দেশের ইতিহাসকে সবুজ দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে এনে ফেলেছেন। ব্যাকগ্রাউণ্ড



"দ্য টিন ড্রাম"/পশ্চিম জার্মানি

স্কোর ছাবধুচর আসল অঙ্গ। ছন্দোবদ্ধ সুরময় সংলাপ জাঁকসোর হাতের প্রধান অস্ত্র। আর জালোস কেন্দ্রের ফটোগ্রাফী তো ভোলার নয়। সারা ছবিতে পঞ্চাশটার বেশি শট নেই। ক্যামেরা নিয়ে তিনি চরিত্রের চোখের সঙ্গে ট্রলি করেন।

রেইনার ওয়েনার ফাসবাইণ্ডার পশ্চিম জার্মানীর এখন সবচাইতে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। পরীক্ষামূলক ও রাজনৈতিক ছবি করার তার ক্ষমতা সর্বজনস্বীকৃত। ব্যাঙ্গালোরে ফাস-বাইনডারের ছবি এসেছিল তিনটি। নির্দ্বিধায় বলব 'দি ম্যারেজ অফ মারিয়া ব্রাউন' সেরা ছবি। মারিয়া নামে এক মহিলা যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কিভাবে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করেছিল এবং স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও অন্য পুরুষকে মই হিসাবে ব্যবহার করে সাফল্যের ছাদে উঠেছিল। নতুন 'স্বাধীন স্ত্রী' হিসাবে মারিয়া নিজেকে যখন প্রতিষ্ঠা করল তখন স্বামী তার অনেক দূরে। অন্য দুটি ছবিতে ('ইন এ ইয়ার উইথ ১৩ মুনস' ও 'দি থার্ড জেনারেশন') ফাসবাইণ্ডারকে আঙ্গিক নিয়ে যুদ্ধ করতে দেখা গেল। কিছুটা ফার্স কিছুটা স্যাটায়ার ঢংয়ে তিনি টেরারিসট মুভমেনট ও পুরুষের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্ত্রীতে পরিণত হওয়াকে ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু শব্দ-সংলাপ-সংগীত নিয়ে যে ব্যায়াম হয়েছে সারাক্ষণ তা নিছক 'দেখানেপনা'

ওয়ের্নার স্ক্রোয়েটরের 'কিংডম অফ নেপলস' ১৯৪৪ থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত নেপলসের এক বস্তির সামাজিক উত্থান পতন, রাজনৈতিক ক্রমবিকাশকে তুলে ধরেছে। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের পতন ও সাধারণ শ্রমিকের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে তিনি প্রেক্ষাপটে নিয়ে এসেছেন। আর সবচাইতে বিস্ময়কর ঘটনা হল ছবিঘরের প্রোজেকসনিসটের বুদ্ধির কৃপায় রিল উল্টো-পাল্টা হয়ে গেল। ৭০ সালের পর আবার দেখলাম ৪৫ সালের ইতিহাস। ম্যাক্সমিলিয়ন সেলের 'এণ্ড অফ দি গেম' ও হেডি জেনির '১+১=৩'

স্বামী-স্ত্রীর ভেঙ্গে পড়া সম্পর্ক নিয়ে তোলা। আজকের ইউরোপে বিবাহ বিচ্ছেদ ও তৎপরবর্তী সমস্যাগুলো যেন বেশি মাথাচাড়া দিয়েছে। এই ছবিগুলো তারই উদাহরণ।

ফ্রানসের তিনটে ছবির মধ্যে নিউজরীল-স্থিরচিত্র-ধারাভাষ্য সহযোগে তৈরি 'দি স্পাইর‍্যাল' একটি মনে রাখার মত ছবি। চিলিতে আলেন্দের সরকার গঠন ও পতনের মধ্যবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ছবিটি বিশ্লেষিত। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কিভাবে ষড়যন্ত্র করে আলেন্দের মৃত্যু ঘটাল তাই নিয়ে সুন্দর প্রামাণিক ছবি এটি। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার, আলেন্দের একাধিক বক্তৃতা থাকায় ছবিটি আরও মনোগ্রাহী ও বাস্তব হয়েছে। অন্য দুটি ছবি ('ক্লাপ দ্যভেৎ', 'সিরে নয়ার') উল্লেখযোগ্য নয়।

উৎসবে জাপানের ছবি ছিল ছটি। তিনটি পুরনো, তিনটি নতুন। মিকিও নারুসির 'ফ্লোটিং ক্লাউডস', তিনোশুকো কিনুগাসার 'দি ল্যানটার্ন' ও কোজাবুরো ইয়োসিমুরার 'দি ব্যাম্বু ডল' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ছবি। কিন্তু নাগিশা ওসিমার 'এমপায়ার অফ প্যাশন' একটি অসাধারণ ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়ে জাপানের এক অজ গাঁয়ে দুই অসমবয়সী প্রেমিক প্রেমিকার সোচ্চার প্রেমের গল্প। স্বামীকে খুন করে দু'জনে মিলনের পথ পরিষ্কার করে। কিন্তু অল্পদিন পরেই অপরাধবোধ এসে অক্টোপাসের মত বেঁধে ফেলে দু'জনকে। কিন্তু জৈবিক আকর্ষণ তাদের আলাদা থাকতে দেয় না। মৃত স্বামীর স্মৃতি বারবার এসে এলোমেলো করে দেয় তাদের সুখ-শান্তি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুলিশের চেষ্টায় দু'জনেই খুনের দায়ে ধরা পড়ে, শাস্তি হয়। ওসিমা প্রেমের বাধাহীন গতিকে নিয়ম-নীতি ও সামাজিক শৃঙ্খলে বাঁধতে চেয়েছেন। মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক শুধু শারীরিক নয়, মানসিক-আত্মিকও। সেখানে ভাঁটা পড়লে শরীরেও টান পড়ে।



“কায়রো স্টেশন”/ইজিপ্ট

এছাড়াও উৎসবের অঙ্গ ছিল জ'া রেঁনোয়া, রোমান পোলানস্কি, ইউসুফ কহিনের রেট্রোসপেকটিভ। পোলানস্কির বেশির ভাগ ছবির বিষয় বীভৎসতা, হ্যালুসিনেশন স্কিজোফ্রেনিয়া ইত্যাকার মানসিক রোগ। কয়েকটি ছবি দেখার পর দর্শকরাও রোগাক্রান্ত হতে পারেন এমন নিপুণ হাতে তৈরি ছবিগুলি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ওর সাম্প্রতিক ছবি ‘টেস’। পরিচ্ছন্ন প্রেমের ছবি। একেবারে অন্য পোলানস্কিকে পাওয়া গেছে ঐ ছবিতে।

ইউসুফ কহিন শুনেছি মিশরের ‘সত্যজিৎ রায়’। তার ছবিগুলো সব দেখা হয়নি। ‘আলেকজান্দ্রিয়া হোয়াই’ ও ‘কায়রো স্টেশন’ সামাজিক ছবি। মিশরের মিশ্র অর্থনীতির মধ্যে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের একটি বাস্তব ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রমোদ নয়, সামাজিক বিশ্লেষণই তার ছবিগুলির মূল প্রতিপাদ্য ছিল। সমাজ সচেতন পরিচালক তিনি।

ফেরবার সময় মনে হচ্ছিল কবে আবার এমনতরো একটা উৎসব হাজির করা হবে কলকাতায়। জানি না। উৎসব কর্তৃপক্ষ কোন মন্তব্যও করেননি। কলকাতার বড় বড় পরিচালকরা জানি না কোন অজ্ঞাত কারণে নিজের শহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। উপরন্তু কলকাতার ফিলম ইনডাস্ট্রিরও তেমন গরজ নেই। সত্যি সত্যিই ’৮২ ফিলমোৎসব যদি হায়দ্রাবাদ, ত্রিবান্দ্রম কিংবা বম্বেতে পাড়ি দেয় আশ্চর্য হবার কিছু নেই, একটু দুঃখবোধ ছাড়া।

অবশ্য সময় আছে এখনো। একাশিতে দিল্লির ৮ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, তারপরই নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত। যদি এর মধ্যে কলকাতার ঘুম ভাঙ্গে তাহলে হয়তো গা ঝাড়া দিয়ে একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করলেও করতে পারে।

প্রেমের এই আত্মিক-শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি আরও একটি বিস্ফোরণকারী ছবি করেছিলেন, নাম—‘এম্পায়ার অফ সেনসেস’। সে ছবি এখানে আসেনি। এটি তারই দ্বিতীয় পর্যায়।

সুজি তেরায়ামার ‘বকসার’ আহা-মরি কিছু নয়। কিন্তু পরিচালকের প্রয়োগ নৈপুণ্য অবশ্যই লক্ষ্য করার মত। কে কুমাইয়ের ‘ওগি নহার লভ এণ্ড ফেথ’ও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ফিলমোৎসবের সেরা দু'খানি ছবি দেখানো হয়েছিল প্রায় শেষ পর্বে। বার্তোলুসির ‘১৯০০’ এবং ভোলকার স্কোলনডর্ফে'র ‘টিন ড্রাম’ আসবে কি আসবে না তাই নিয়ে দ্বিধা ছিল। শেষ মুহূর্তে এসেছে এবং সত্যি কথা বলতে কি উৎসবের মুখরক্ষা করেছে।

‘১৯০০’ বার্তোলুসির বহু আলোচিত ছবি। দুই বন্ধুর সখ্যকে কেন্দ্র করে ইতালীতে মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ কিভাবে আস্তে আস্তে থাবা ফেলেছে তারই এক প্রামাণিক ও মানবিক ছবি এটি। পাঁচ ঘণ্টার এই ছবিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনার গতি অত্যন্ত তীব্র, বেগবান। নাটকের সন্নিবেশ বড় ঘনিষ্ঠ। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর দ্রুত অশ্বক্ষুরের মত শব্দায়িত। সময়ের বিরাট ক্যানভাসটিকে পরিচালক নিপুণ শিল্পীর মত শুধু রং নয়, মন আর আবেগ, যুক্তি ও বুদ্ধির প্রলেপে রাঙিয়েছেন। ইতালীর চাষী জীবন, জমিদার শ্রেণীর অকথ্য অত্যাচার দেশের প্রত্যন্ত কোন শহরে ফ্যাসিবাদের নিচু প্যায়ে পদধ্বনি সব কিছুই এসেছে ঘটনাকে অনুসরণ করে।

উৎসবের আর একটি মনে দাগ কাটার মত ছবি হল ভোলকার স্কোলনডর্ফে'র ‘টিন ড্রাম’। এবছর কানে সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছিল এই ছবি। হিটলারের অভ্যুত্থানের সময়ের অবস্থাকে ইঙ্গিত করে একটি স্যাটায়ারধর্মী ছবি এটি। প্রচণ্ড শক্তিশালী পরিচালক স্কোলনডর্ফ। মহাযুদ্ধের পটভূমিতে পোলিশ এক রিফিউজির জার্মান মহিলার সম্পর্ককে ঘিরেই এই ছবির আখ্যানভাগ গঠিত। মহিলাটির শিশু সন্তান একটা টিনের ড্রাম বাজিয়ে চিৎকার করলেই সামনের সব কাঁচের জিনিস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। হিটলারের উত্থানের ক্ষণভঙ্গুরতাকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি। কিন্তু কয়েকটি দৃশ্যের শারীরিক আতিশয্য চোখকে বড় পীড়া দেয়। দুঃসাহসী তিনি।



“ক্যুই ভিভা মেকসিকো”/রাশিয়া

ইনডিয়ান প্যানোরামা না সাউথ ইনডিয়ান প্যানোরামা ?

নির্মলেন্দু বসু

প্যানোরামা বিভাগটির জন্ম ১৯৭৮ জানুয়ারিতে। মাদ্রাজে ফিলমোৎসবের সময় উৎসব কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ভাষায় উন্নতরুচির শিল্প-সমৃদ্ধ ছবিগুলোকে আন্তর্জাতিক অতিথিদের কাছে তুলে ধরতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির বিবিধের মাঝে মহামিলনের সুরটি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। তখনই ঠিক হয়েছিল এই বিভাগে তরুণ প্রতিশ্রুতিবান পরিচালকদের ছবিই প্রাধান্য পাবে। প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ পরিচালকরা সুযোগ পাবেন দ্বিতীয় চিন্তায়।

১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সালে যে এই সিদ্ধান্ত ও প্রতিশ্রুতি সর্বতোভাবে পালন করা হয়েছিল তা নয়। বহু ব্যতিক্রম ঘটেছে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল প্রমুখের ছবি আগের প্যানোরামায় অবশ্যই ছিল। এ নিয়ে বিতর্কও হয়েছে।

ব্যাঙ্গালোরের ফিলম উৎসব ১৯৮০তে যাদের ছবিগুলো নির্বাচন করা হয়েছে তাদের অনেকেই যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের দরজায় পা রেখেছেন ; ২১ জনের মধ্যে অন্তত ১২ জন। শিল্পসমৃদ্ধ নতুন ভাবনার ছবির ক্ষেত্রে অবশ্যই বয়েসটা বিবেচ্য হতে পারে না, কিন্তু ভারতের মত বিভিন্ন ভাষাভাষীর দেশে বয়সের দাঁড়ি দিয়ে গণ্ডী না বাধলে আঞ্চলিক সিনেমার অগ্রগতি সম্ভব নয়।

দক্ষিণ ভারতের তরুণ চলচ্চিত্রকারদের মহলে এই নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন সত্যজিৎ রায়ের আলাদা রেট্রোসপেকটিভ হওয়া সত্ত্বেও তার 'জয় বাবা ফেলুনাথ'কে প্যানোরামা বিভাগে রাখা হল কেন ? বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম অন্নপূর্ণা' কিংবা পূর্ণেন্দু পত্রীর 'মালঞ্চ' সেক্ষেত্রে সুযোগ পেতে পারত।

হাস্যকর ঘটনা ঘটেছে 'মালঞ্চ'কে নিয়ে। উৎসব শুরুর অল্প ক'দিন আগে কর্তৃপক্ষ একটি চিঠিতে পূর্ণেন্দু পত্রীকে জানিয়েছিল তার 'মালঞ্চ' ছবিটিকে ভারত সরকার বারলিন উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঐ ছবির যে প্রিনটটি (সাব-টাইটেল সহ) প্যানোরামা বিভাগে দেখানো হবে সেটিই বারলিনে পাঠানো হচ্ছে। মজার ব্যাপারটা হল পূর্ণেন্দু বাবু সাব-টাইটেল করার জন্য চিত্রনাট্যের ইংরেজি অনুবাদ কিংবা 'স্পটিং শিট' কিছুই পাঠাননি। তিনি ঐ চিঠি পেয়ে বিস্মিত ও আনন্দিত। 'প্যানোরামা'য় ছবিটি দেখানো হচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন তিনি। আমি নিজে সেই চিঠি পড়েছি।

অথচ ব্যাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিনেই উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে জানলাম—না, 'মালঞ্চ' নির্বাচিত হয়নি। পূর্ণেন্দু বাবুর পাওয়া চিঠির কথা বলতে একজন মুখপাত্র বললেন—'তাই নাকি ? তাহলে ভুল করে লেখা হয়ে গেছে।' পরের দিন উৎসব পরিচালক রঘুনাথ রায়নাকে 'মালঞ্চ' সম্পর্কে প্রশ্ন করায় জবাব দিলেন—'ছবির মান উপযুক্ত নয়'। অথচ সেই ছবিকে বারলিনে পাঠানো হচ্ছে কোন যুক্তিতে ? এ প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে পারেননি। প্যানোরামার নির্বাচনী কমিটির ওপর দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন।

ইনডিয়ান প্যানোরামার সর্বভারতীয় প্যানোরামার সদস্য

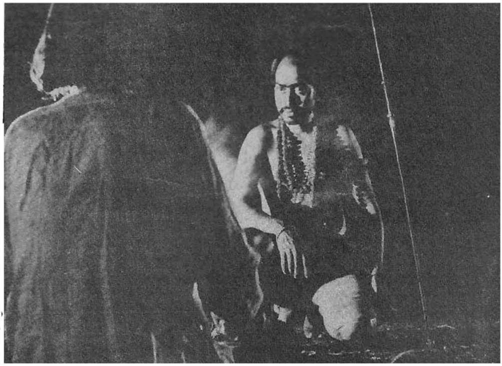
বি কে করনজিয়া (সভাপতি)
বি আর চোপড়া
ফিরোজ বেঙ্গুনওয়ালা
এম ভক্তবৎসল
জি অরবিন্দন (যাননি)
তরুণ মজুমদার (যাননি)

আরও একটি মজার ঘটনা হল এই বিভাগের ছবি নির্বাচন নাকি নভেমবর মাসের শেষ সপ্তাহেই হয়ে যায়। অথচ মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন' ডিসেমবর মাসের মাঝামাঝি সেনসর হবার পরও প্যানোরামায় জায়গা পায় কি করে ? মৃণাল সেনের ছবিকে কমিটি কি তাহলে না দেখেই ছাড়পত্র দিয়েছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরায়না বললেন—'পরিচালকের শ্রেণী ও সম্মানকে মর্যাদা দিতে হয় বৈকি !'

এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কান্নাড়ে পরিচালক পি-লংকেশ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চিঠি প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকদের ডেকে বললেন—'কমিটি পরিচালকের নাম দেখেই ছবি নির্বাচন করেছেন, ছবি দেখে নয়। শুধু শ্রীলংকেশ নন, দক্ষিণ ভারতের ফিলম চেমবারের সভাপতি শ্রী এম ভক্তবৎসলও উৎসব কর্তৃপক্ষের নানা ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। তিনিও ছিলেন নির্বাচনী প্যানেলে।

শেষ পর্যন্ত এমন ঘটনা দাঁড়াল যে দক্ষিণ ভারতের তরুণ পরিচালকদের যে ছবিগুলো কমিটি বাতিল করেছিলেন, সেগুলো নিয়ে শ্রীভক্তবৎসলের সহযোগিতায় কয়েকজন তরুণ পরিচালক উৎসবের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এক 'মিনি প্যানোরামা'র আয়োজন করেছিল কৈলাস ছবিঘরে। বারোটি ছবি দেখানো হল এই বিভাগে।

প্যানোরামা বিভাগের এত খুঁতখুঁতে নির্বাচনও হাস্যকর। একুশটি ছবির মধ্যে বাংলা, হিন্দি ও মালায়লাম ভাষার ছবি ছিল চারটি করে, তিনটি ছিল কন্নাড়া ভাষায় ও



সর্বসাক্ষী/সারথী



আক্রিয়থা কোনাজল/তামিল

মারাঠি তেলুগু ও তামিল ভাষার ছবি ছিল দুটি করে।

শ্রীলংকেশ অভিযোগ করেছিলেন পরিচালকের নাম দেখেই ছবি বাছাই করা হয়েছে। আমার ধারণা সর্বক্ষেত্রে বোধহয় সেই নামটি দেখারও প্রয়োজনবোধ করেননি। ওপর ও বিভিন্ন মহলের সুপারিশেই চোখ বন্ধ করে ছবি নির্বাচন করেছেন। যদি তাই না হবে, তাহলে বিনোদ পাণ্ডের 'এক বার ফির' এর মত সাধারণ ফরমুলার ছবি জায়গা পায় কি করে ? তার পরিচালনার কাজে অবশ্যই সজীবতা আছে, কিন্তু একমাত্র সেই কারণে ছবিটি নির্বাচিত হবার দাবি জানাতে পারে কি ? কে আর মোহনমের 'অশ্বথামাও' কোন যোগ্যতায় নির্বাচকদের হাতে পাস মার্কস পেল জানতে ইচ্ছে করে ? বাসু ভট্টাচার্যের 'গৃহপ্রবেশ'ই বা কি করে প্রবেশাধিকার পেল ? প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল, অবাস্তব ছবি এটি। রামদাস পুটানের মারাঠী ছবি 'সর্বসাক্ষী'র বক্তব্যও পরিচ্ছন্ন নয়। অত্যন্ত নাটকীয়, অ্যামেচারিশ কাজ বলা যায়।

উপরন্তু অন্যান্য ছবিগুলির বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান অভিযোগ হল তাদের না-বাচক উপসংহার। কোন ছবিতেই পজেটিভ এনডিং নেই। আঞ্চলিক কুপ্রথা রীতিনীতির প্রতি বিরোধিতা আছে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নরম সুরে প্রতিবাদ আছে, ব্রাহ্মণ সমাজের ধর্মীয় শোষণ ও শাসনের প্রতি ইঙ্গিত আছে ; কিন্তু কোথাও জেহাদ নেই। এই নিয়মভঙ্গের কোন ডাক নেই কোন ছবিতে।

কান্নড়া পরিচালক টি-এস-নাগাভরণ বললেন—'আমি নেগেটিভ এনডিং পছন্দ করি। 'না' এর মধ্য থেকেই একদিন সঠিক 'হ্যাঁ' এর জন্ম নেবে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ আমি আজ এই মুহূর্তে যেটিকে সঠিক বলে মনে করছি, কাল প্রমাণ হতে পারে সেটি সঠিক নয়। আমাকে এজন্য পেসিমিসট বলতে পারেন আপত্তি নেই।' ওর 'গ্রহণ' অবশ্যই প্যানোরামার একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। বাইরের দু-তিনটে দেশে গিয়ে প্রাইজও নিয়ে এসেছে।

মালায়লাম পরিচালক পি-পদ্মরাজনের 'পেরুভজি আম্বলম' (দি ডেড এনড) গ্রামের একটি সামগ্রিক নৈতিবাচক চেহারা তুলে ধরেছে। মেরুদণ্ডহীন একদল মানুষের ভীতি এ ছবির কেন্দ্র। গ্রামের কুখ্যাত গুণ্ডাকে আকস্মিক দুর্ঘটনায় খুন করার পর কিশোর খুনী ভেবেছিল গ্রামের লোকের কাছে সে হয়ত নায়কোচিত সম্বর্ধনা পাবে। কিন্তু তা সে পেল না। বরং পুলিশের ভয়ে কেউই তাকে আশ্রয় দিতে চাইল না গ্রামে। শেষ পর্যন্ত নিহত গুণ্ডার স্ত্রীর কাছে যেতে হল তাকে। সেখান থেকেও বিতাড়িত হল। কিন্তু চলে যেতে গিয়েও জানলায় অপেক্ষমান পিতৃহীন দুটি শিশুর সরল চাউনির দিকে তাকিয়ে সে আর পালাতে পারল না। পেছনের দেয়ালে আটকে যেতে হল। পদ্মরাজন কেরালার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। পুরস্কৃতও। 'পেরুভজি' ওর প্রথম ছবি। অত্যন্ত সুসংবদ্ধ হাতে পরিচালনা করেছেন।

তেলুগু ছবি 'নিমজ্জনম' (বি-এস-নারায়ণও) নেগেটিভ ধর্মী। প্রৌঢ় এই পরিচালক ব্যবসায়ী চিত্র মহলে প্রতিষ্ঠিত। এ পর্যন্ত পঁচিশটি ছবি করেছেন। 'জ্বাথুবুলু' তার প্রথম পরীক্ষাধর্মী ছবি, 'নিমজ্জনম' দ্বিতীয়। প্রথম ছবিটি দেখিনি। দ্বিতীয় ছবিতে একমাত্র দর্শনীয় কয়েকটি শট কমপোজিশন ও ক্যামেরার কাজ। শক্ত বাঁধুনিতে আটকাম ছবি। বক্তব্য ও কাহিনীতে রয়েছে প্রবল স্ববিরোধ।

শ্রীনারায়ণ বলেছেন ভারতীয় নারীজাতির সনাতন সতীত্বের আদর্শকে নাকি উজ্জ্বল করে তুলেছেন। প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল গল্প। বিবাহিতা এক ব্রাহ্মণ মহিলা ধর্ষিতা হবার আত্মগ্লানিতে আত্মবিসর্জন দিল। এবং সেই সংবাদ শুনে ধর্ষণকারী গাড়োয়ান নিজের পাপ সম্পর্কে সচেতন হল এবং কাকতালীয়ভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে মারা গেল। ঈশপের গল্পের মত উপদেশ মার্কা কাহিনী নিয়ে এই ছবিতে ভারতীয় নারী চরিত্রের যে কোন আদর্শকে উজ্জ্বল করে তুললেন বুঝলাম না। বরং নায়িকা সারদার অসংবৃত বেশবাসের যে দৃশ্যটি অন্তত ছ/সাতবার ক্লোজ-আপে দেখানো হয়েছে তাতে উত্তেজনার রসদটাই বেশি।

বাসু চ্যাটারজির 'জীনা য়ঁহা' (লাইফ ইজ ইন দি মেকিং) তার পুরনো পরিচয়কে ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করবে। 'সারা আকাশ' 'পিয়াকা ঘর' ইত্যাদি ছবিতে যে সজীব সুগন্ধী হাওয়ার ছোঁয়া পাওয়া গিয়েছিল, এ ছবিতে আবার তা ফিরে এসেছে। ব্যবসায়ীচক্রের গোলকধাঁধায় একাধিক ছবি তিনি করেছেন। 'জীনা য়ঁহা' পুনর্জন্ম ঘটাবে বাসু চ্যাটারজির। অত্যন্ত সরল ভঙ্গিতে ছোট ছোট দৃশ্যে, রসপূর্ণ সংলাপে এবং সূক্ষ্ম কয়েকটি কাটিংয়ে শহর ও গ্রাম জীবনের সৌন্দর্য-বেদনা-আনন্দ-দুঃখকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শহরের দম বন্ধ করা হাওয়ায় বাঁচার ছটফটানিটুকুই বেশি, স্বতঃস্ফূর্ততা কোথাও নেই। মেশিন হয়ে যাচ্ছে মানুষ। নীল আকাশ-জীবাণুহীন হাওয়া-দিগন্তবিস্তৃত চোখ জুড়ানো সবুজ কোথাও শান্তি নেই। নগর-কেন্দ্রিক জীবন মানুষকে নিশ্চিন্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তবুও পতঙ্গের মত সেদিকেই চলেছে সবাই।

গিরিশ কাশরাবল্লী অবশ্য নিরাশ করেছেন বলব না, বরং বলি—নতুন আশা জাগাতে পারেননি। ওর প্রথম কান্নাড়া ছবি 'ঘাট শ্রাদ্ধ' স্তম্ভিত করেছিল আমাদের। কাহিনীর সামাজিক গুরুত্বে, প্রকরণের সাবলীলতায় 'ঘাট শ্রাদ্ধ'র স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল। গিরিশের নতুন ছবি 'আক্রমণ'। এর পটভূমি গ্রাম এবং ছোট শহর। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনগুলো মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে কিভাবে অনেক সময় নতজানু করে বসিয়ে দেয়—সেটুকুই তিনি বলেছেন প্রধান তিনটি চরিত্র লক্ষ্মী রবি-নন্দিনীর মধ্য দিয়ে। চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সিনেমাটিক্যালি রবি চরিত্রটিকে দুটি/তিনটি দৃশ্যে তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। ফিলমের

যতি-চিহ্ন ব্যবহারে 'আক্রমণ' অবশ্যই অনেক বেশি ম্যাচিওর। এ ছবির আবহ সংগীত গল্পের অনুসারী, ভঙ্গির পরিপূরক। বি ভি কারনাথ কান্নাড়া লোকগীতি ও ড্রাম বাদ্য-যন্ত্রটিকে কাজে লাগিয়েছেন বেশি।

বিমল দত্তের হিন্দি ছবি 'কস্তুরী'তে নতুন মেজাজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দৈনন্দিন বাস্তবতার বড় অভাব। চরিত্রগুলির বিশ্লেষণেও গভীরতা কম। অবশ্য প্রথম ছবি হিসাবে তার প্রচেষ্টাকে বাহবা দিতে হবে।

কান্নাড়া ছবিতে জাত-পাতের ঘটনাগুলো বেশি স্থান পায়। উঁচু জাতের লোকরা নানা ধর্মের খোলসে অত্যাচার চালায় নিচু জাতের ওপর। কর্ণাটকের গ্রামে গ্রামে এখনও সেই অবিচার অব্যাহত। টি-এস-রঙ্গের 'সাবিত্রী' ছবিতে জাত-পাতের অত্যাচার, কুসংস্কার, পারস্পরিক লোভ, ক্রোধেরই প্রাধান্য। ছাত্রী ও শিক্ষকের মিষ্টি সম্পর্কটাকে দুই অভিভাবকের বিরোধ তিক্ততায় ভরে দিল। সুন্দর ডিটেলসের কাজ, প্রধান দুটি চরিত্রের মানসিক লেনদেন পর্ব পেলব সৌন্দর্যে উপস্থিত। ওর প্রথম ছবি 'গীজগন গুড়ু' দেখেছেন এমন লোকের কাছে শুনেছি 'সাবিত্রী' নাকি তুলনায় অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। তরুণ এই কান্নাড় পরিচালক ব্যাঙ্গালোরের ফিলম চেমবারের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। শুনলাম ওর আগের ছবি ব্যবসায়িক ভাবে দারুণ সফল হয়েছে। এই ছবিও হবে।

কর্ণাটক ফিলম চেমবারে লোকজন মৌখিক প্রশংসার ফুলঝুরি ছোটালেও এদের ছবি পরিবেশনা বা প্রদর্শনের দায়িত্ব নিতে নারাজ। উপরন্তু ব্যাঙ্গালোরের সাজানো গোছানো হলগুলোর রাক্ষুসে ভাড়া জোগানোর মত ক্ষমতা এই সব অল্প বাজেটের ছবির নেই।

কর্ণাটকের ছবির 'গডফাদার' শ্রীভক্তবৎসলের বিরুদ্ধে এখানকার কিছু তরুণ অভিযোগ করছেন দক্ষিণ ভারতের 'নিও-ওয়েভ' ছবির প্রশংসায় তিনি গদগদ হবার ভান করেন। কিন্তু কই—এ পর্যন্ত কটা অল্প বাজেটের ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন? সথ্যুর 'কাম্নেশ্বর রামা' ছবির প্রযোজক ছিলেন বলেই একমাত্র এই ছবিটি পরিবেশনা করেছিলেন তিনি। আর নয়।

অবশ্য এই শ্রীভক্তবৎসলই উৎসবের পাশাপাশি মিনি প্যানোরামার ব্যবস্থা করেছেন ব্যাঙ্গালোরে। নতুন তরুণ পরিচালকদের উৎসাহ দেবার জন্য তার এই একক প্রচেষ্টা অনেকের মন কেড়েছে। অপর পক্ষ বলছেন, 'ওগুলো হচ্ছে লোকদেখানো প্রেম'। শ্রীভক্তবৎসল নিজে আমাকে বলেছেন উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে তার দ্বিমত হয়েছে। কোন কোন সময় ভেবেছেন কমিটি ছেড়ে চলে আসবেন। কিন্তু আসেননি একটিমাত্র কারণে। ব্যাঙ্গালোরের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বন্ধ হয়ে যাক এটা তার কাম্য ছিল না।

ঐ মিনি প্যানোরামায় অবশ্য একটি মাত্র ছবিই ছিল উল্লেখযোগ্য। পি-লঙ্কেশ এর 'এল্লিনডাগো বাণ্ডাভারু'। 'পল্লবী' বা 'অনুরূপার তুলনায় আরও বেশি শক্তহাতে ও বুদ্ধি দিয়ে ছবিটা তিনি করেছেন বলা যায়, কিন্তু মনে চিরস্থায়ী ছাপ রাখার মত কোন বক্তব্য বা প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নেই। এই বিভাগের অন্যান্য ছবিগুলি ছিল শঙ্কর নাগের 'মিনচিনা ওটা', দেবদাস কানকালের 'চালে চিমেলু', বাপুর 'গ্রন্থদীপম', বুদ্রায়ার 'আন্ডাল আম্মাদিথন', শ্রীধর ক্ষিরসাগরের 'এ গ্রেট ইনডিয়ান ফিলম বাহার'।

এই প্যালটা মিনি প্যানোরামা হওয়ায় উৎসব কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি বিরক্ত না হয়ে এখান থেকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা নেন তাহলে আগামী বছরের প্যানোরামার ছবি নির্বাচনে ভুলত্রুটি ও বিতর্কের কম অবকাশ থাকবে।

এ বছর একুশটি ছবির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের ছবি ছিল এগারটি। একজন বিদেশী সাংবাদিক বলেছিলেন 'ইজ দিস ইনডিয়ান প্যানোরামা অর সাউথ ইনডিয়ান প্যানোরামা?'

ওড়িয়া বা অসমিয়া ছবিকে অচ্ছুৎ করে রাখা হবে কেন? এগারটি দক্ষিণ ভারতীয় ছবির মধ্যে দর্শনীয় ছিল মাত্র তিন-চারটি। বাকিগুলো জায়গা পেয়েছে শূন্যস্থানের 'কোটা' পূরণের দাবিতে। নইলে কোন কারণে পূর্ণেন্দু পত্রীর 'মালঞ্চ', বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম অন্নপূর্ণা', শংকর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' জায়গা পায় না? অজিত লাহিড়ীর 'চামেলী মেমসাহেব' বাতিল হয়, বিনোদ পাণ্ডের 'একবার ফির' অনুমোদন পায়। আসামের 'গঙ্গা চিলনীর প্যাখি' আঞ্চলিক ছবি হিসাবে কেন জায়গা পায় না?

১৯৮১র অষ্টম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্যানোরামায় যেন বিখ্যাত পরিচালকরা জায়গা ছেড়ে দিয়ে নতুনদের একটু এগিয়ে আসতে সাহায্য করেন। এটা যেন তারা ভুলে না যান আজকের সম্মান পাবার জন্য একসময় তাদেরও যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এবং উৎসব কর্তৃপক্ষও যেন প্রতিষ্ঠিত নামের প্রতি দুর্বলতা ছেড়ে নতুনদের দিকে নজর দেন। আমি এখুনি কয়েকটা সম্ভাব্য ছবির নাম করছি। সেগুলির আগামী উৎসবে জায়গা পাওয়া অবশ্যই উচিত। যেমন —জব্বর প্যাটেলের 'সিংহাসন' (মারাঠি), উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'ময়না তদন্ত' (বাংলা) ভি-এন-জাটলার 'প্রত্যুষ' (তেলুগু), কে বালচন্দরের 'নুল ভেলি' (তামিল), পি-এ বেকারের 'মান্নিস্তে মারিল', জন আব্রাহামের 'চেরিয়াচান্তে ক্রুরা কির্তাঙ্গল' (মালায়ালম), ভি-এস-নারায়ণের 'জ্বালা', রামকৃষ্ণ উল্লরের 'সর্পসুলতু' (কান্নাড়া), গোবিন্দ নিহলনীর 'আক্রোশ', অজিত লাহিড়ীর 'চামেলী মেমসাহেব' সাই পরানজপের 'স্পর্শ' (হিন্দি) ও ঝানু বড়ুয়ার 'অপরূপা' (অসমিয়া)।

সুসম সংখ্যায় সব ভাষার ছবিকে প্রাধান্য না দিতে পারলে আবার আসছে বছরও হয়ত শুনতে হবে 'ইজ দিস ইনডিয়ান প্যানোরামা অর···?' ★


গ্রহণ/কানাড়া



সেনসরশিপ মোটেই ভালো নয় ঃ সত্যজিৎ রায়

বিশেষ প্রতিনিধি

ব্যাঙ্গালোরের ফিলমোৎসব কলকাতার পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তার ছবি তৈরির পাঁচিশ বছর উপলক্ষে একটি বিরাট সম্বর্ধনা জানাল। সত্যজিৎ রায়ের বাইশটি ছবি নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল পল্লবী থিয়েটারে। তিনি নিজে এসেছিলেন ব্যাঙ্গালোরে সেই রেট্রোসপেকিটভের উদ্বোধনী সন্ধ্যায় যোগ দিতে।

সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে তিনি অভিভূত হয়ে বলেছেন, ব্যাঙ্গালোর ভারতের মধ্যে সবচাইতে বেশি film conscious শহর। জানি না, এই তকমা পাবার উল্লাসেই কিনা, কাঙ্ক্ষিত দৃশ্য না দেখতে পাবার জন্য প্রথম সপ্তাহে শহরের সাতটি হলে টিকিটের টাকা হামলা করে ফেরত নিয়েছে এইসব film conscious দর্শকরাই।

সত্যজিৎ রায়ের সাংবাদিক সম্মেলন বসেছিল অশোক হোটেলে। শুরুতে বেশ কয়েক মিনিট অস্থির নীরবতা। কে প্রথম প্রশ্ন করবেন তাই নিয়েই অস্বস্তি। সত্যজিৎ রায় নিজেই হেসে ফেললেন। ঘরভর্তি সাংবাদিকরা সবাই মুখবন্ধ করে। একবার মুখ খুলতেই বন্যার জল ঢুকে পড়ল যেন। একের পর এক প্রশ্ন।

—সেনসরশিপ সম্পর্কে আপনার কি মত?

: অ্যাজ এ রুল সেনসরশিপ মোটেই ভাল নয়। যদিও আমাকে কখনও সেনসর-টেবিলে পড়তে হয়নি। তাছাড়া সেনসর বোর্ডের সদস্যদের প্রখর বুদ্ধিমান হওয়া দরকার যারা ফিলমের পরিপ্রেক্ষিতেই সব কিছু বিচার করবে।

—বহু বছর আগে একটি সায়েন্স ফিকশন করবেন বলেছিলেন, এখনও কি সেই ইচ্ছে আছে।

: হ্যাঁ, আছে বই কি! প্রযোজক পেলেই করব। স্ক্রিপ্ট আমার রেডি। তখন না করে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। ঐ ছবিতে সাউনডের দারুণ ভূমিকা আছে। তখন হলে হয়ত ঠিক করতে পারতাম না। এখন সাউনড সিসটেম অনেক উন্নত। স্টার ওয়ার্স, ক্লোজ এনকাউনটার দেখে মনে হয়েছে এখন করা যায়। তবে নাম বোধহয় পালটাতে হবে। (আগের নাম ছিল 'দি অ্যালিয়েন')

—প্রথম পাঁচটি ছবিতে অন্য সংগীত পরিচালক নেবার পর নিজেই মিউজিক রাইটিং আরম্ভ করলেন কেন?

: অ্যাকচুয়ালি সংগীত আমার প্রথম প্রেম; ফিলমেরও আগে সংগীতের প্রতি আমার ভালোবাসা জন্মেছিল। রবিশঙ্কর, বিলায়েত খাঁ, আলি আকবরের বাজনা আমার দারুণ ভালো লাগে। ওরা দিনকে দিন ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন, জনপ্রিয়তা বাড়ছিল, সময় দিতে পারছিলেন না, তাই আমাকেই অগত্যা কষ্ট করে মিউজিক রাইটিং শিখতে হল। কাজটা খুবই কঠিন। এখন রপ্ত করে নিয়েছি।

—আজকের ভারতীয় ছবি সম্পর্কে আপনার কি মত?

: ভালো কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে, এটা স্বাস্থ্যকর। বাংলার অবস্থা খুবই খারাপ। লোডশেডিং তার ওপর বাড়তি সমস্যা।

—ছোটদের ছবি হয় না কেন?

: ছোটদের ছবি তো শুধু ছোটদের জন্যই নয়। বড়দেরও তা ভালো লাগা দরকার। সে রকম লোক হয়ত নেই। ছোটদের ছবির বড় গুণ হল ছোট-বড় সবার পছন্দ হওয়া।

—আপনার ছবি বিদেশে ভালো ব্যবসা করে, অথচ ভারতে করতে পারে না কেন?

: পশ্চিম বাংলায় তো ভালই করে। অন্য প্রদেশে না করার কারণ বোধহয় ছবিগুলোর সাবটাইটেল ছাড়াই রিলিজ হওয়া। সংলাপ বুঝতে না পারলে ছবির রস গ্রহণ করা অসম্ভব। অথচ বিদেশে যখন রিলিজ হয় ছবিতে সাবটাইটেল থাকে, সবাই বুঝতে পারেন।...এছাড়া তো আর কোন কারণ দেখি না।

—চলচ্চিত্র সমালোচনার মান কি বেড়েছে?

: নিশ্চয়ই বেড়েছে। অন্তত কলকাতার ফিলম সোসাইটিদের নানা মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় দারুণ interesting আলোচনা আমি পাই। আমার ছবি নিয়েও লেখা হয়। চমৎকার সব লেখা। কিন্তু পেশাদারী সমালোচনার মান তেমন উন্নত হয়নি। ছবির গল্পটাকে নিয়েই কয়েক কলম আলোচনা করেন তারা। 'সম্পাদনা যথাযথ, ক্যামেরার কাজ ভালো...ইত্যাদি' বলে সিনেমার মূল ব্যাকরণটা নিয়ে আর দু-পাঁচ লাইনও লেখা হয় না।

ঐ সাংবাদিক সম্মেলনেই মসকো থেকে আসা একদল রুশ চলচ্চিত্র প্রতিনিধি সত্যজিৎ রায়ের হাতে তুলে দেন রুশ চলচ্চিত্রের ষাট বছরের স্মারক উপহারটি।

রাজনীতি ভালো লাগে না ঃ পোলানসকি

বিশেষ প্রতিনিধি

ছোটখাট চেহারা, ভয়ানক স্মার্ট, বুদ্ধিমান। দেখলে বয়স মনে হয় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ, আসলে ছেচল্লিশ। সুন্দর ইংরেজি বলতে পারেন। লজ ফিলম স্কুলে হাতেখড়ি। তার আগে ক্রাকোওতে মঞ্চে অভিনয় করতেন। তারও আগে যুদ্ধের সময় মা-বাবাকে হারিয়ে ভবঘুরের মত এর-ওর বাড়িতে বয়স বেড়েছে পোলানসকির। যুদ্ধ শেষে বাবা ফিরলেও, মা কনসেনট্রেশন ক্যামপ থেকে ফেরেননি।

ফিলম স্কুল থেকে পাশ করে প্রথম ছবি করলেন ওয়ারশতে। 'নাইফ ইন দি ওয়াটার'। দারুণ সাড়া জাগাল। তারপর সরকারী ফিলম সংস্থার সঙ্গে মন কষাকষি করে একেবারে দেশ ছাড়া। ইউরোপ-আমেরিকায় স্বাধীন ভাবে

ছবি করে যাচ্ছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেই বললেন—'ক্যাপিট্যালিসটিক সোসাইটিতে নিজের পছন্দমত ছবি করার জন্য প্রযোজক পাওয়া যায়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে একবার স্ক্রিপ্ট বাতিল হলে একবারেরই বাতিল।'

: রাজনৈতিক ছবি করেন না কেন ?

—রাজনীতি আমার ভালো লাগে না। মুহূর্তে মুহূর্তে নীতি বদলে যায়। কেউ কি কখনও ভেবেছিল চীন ভিয়েতনাম আক্রমণ করতে পারে, আফ্রিকার দেশে দেশে কিউবার সৈন্য নামবে? কম্যুনিস্ট দেশের বিমান থেকে নামবেন পোপ!—এসব কোন রাজনীতির পর্যায়ে পড়ে বলুন ?

: সব ছবিই তো কোন না কোন ভাবে রাজনৈতিক?—সেভাবে বলতে গেলে আমার সামনের এই মুভি ক্যামেরাটাও তো রাজনীতির ফসল।

: ফিলমের সামাজিক প্রতিক্রিয়া কি আপনি স্বীকার করেন ? ফিলম কি সমাজকে ধ্বংস করতে পারে ?

—না। সমাজের ওপর কোন ইনফ্লুয়েনস নেই সিনেমার। থাকলে এত হিংসা মারামারি কেন? তেহেরানে ইসলামী জিগির তুলে মানুষ মারা, কঙ্গোর রক্তবন্যা, ভিয়েতনামে কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে কোন ফিলমের কতটুকু প্রতিক্রিয়া আছে? ফিলম একটা সমাজকে ধ্বংসের পথে কখনই নিয়ে যেতে পারে না। পারে রাজনীতি।

: গল্প নির্বাচনের সময় মানসিক মাপকাঠি কি থাকে ?

—কিছু না। গল্প ভাল-মন্দ লাগার ব্যাপারটা খুবই তাৎক্ষণিক। হঠাৎই লেগে যায়। অনেকটা আপনাদের সুস্বাদু লস্যির মত। চিনি নুন ঠিক ঠিক পরিমাণে দিলেই স্বাদ হয়। এর কোন মাপকাঠি নেই।

: পোল্যান্ডে গিয়ে আবার ছবি করবেন কি ?

—ইচ্ছে থাকলেও আপাতত নয়।

: ওখানকার পরিচালকরা তো বলেন যে তারা স্বাধীনভাবেই কাজ করতে পারেন, কোন হস্তক্ষেপ নেই। আপনি অন্যকথা বলছেন কেন ?

—একথা না বললে যে ওয়ারশ ফিরে যাবার প্লেন অন্যত্র চলে যাবে।

: বিদেশে কার ছবি আপনার ভালো লাগে ?

—'সিটিজেন কেইন' আমার মতে সর্বকালের সেরা ছবি। ক্যারল রিডের 'অড ম্যান আউট' ভালো লেগেছিল। ভাল লেগেছিল বুনুয়েলের 'লস অলভিদাদস'। এখন



ভাল লাগে কুব্রিক, কোপোলার কাজ।

: ভারতের ছবি সম্পর্কে কি ধারণা ?

—ভারতের ছবি আমি প্রায় দেখিইনি বলতে পারি। সত্যজিৎ রায়ের ছবিই শুধু দেখেছি। এবার এসে তিন-চারটে ছবিমাত্র দেখলাম। সুতরাং মন্তব্য করাটা নিতান্তই সুপারফিসিয়াল হবে। তাছাড়া ছবিগুলো আমি দেখেছি শিক্ষিত বুদ্ধিমান দর্শকদের সঙ্গে বসে। সাধারণ দর্শকদের মাঝে বসে ছবি দেখাটাই আমার বেশি পছন্দ। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি ভারতীয় ছবি আমাকে তেমন ইমপ্রেস করেনি। নিশ্চয়ই এখানকার ছবির মান আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে অনেক নিচুমানের।

উত্তর দিতে পারেন চটপট। প্রশ্ন শেষ হবার আগেই তার উত্তর এসে যায়। প্রশ্নকর্তাকে কথার মার-প্যাঁচে মাত করে দিতে পারেন।

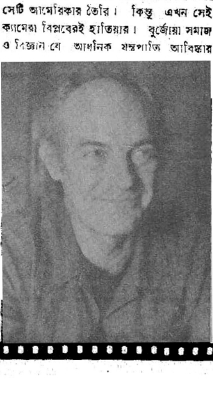
ফিলমোৎসব ৮০তে রোমান পোলানস্কির বাছাই কয়েকটি ছবি দেখানো হল। সেজন্যই তিনি এসেছিলেন ভারতে। এই তাঁর প্রথম সফর। উৎসাহীদের উৎপীড়নে হোটেল থেকে প্রায় বেরোতেই পারেননি। সারাক্ষণ দরজা এঁটে বসে থেকেছেন আর ইনটারভিউ দিয়েছেন। যদিও সাংবাদিকদের তিনি দুচোখে দেখতে পারেন না, সাংবাদিক সম্মেলনের নামে গা চুলকোয়!

ক্যামেরা বিপ্লবের হাতিয়ার ঃ আলেয়া

বিশেষ প্রতিনিধি

পুরো নাম টমাস গুইতেরেজ আলেয়া। জন্ম এবং কর্ম হাভানাতেই। লেখাপড়াও। সশস্ত্র বিপ্লবের সময় লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাননি, হাতে রাইফেল তুলে নিয়েছিলেন।

এখন হাতে আর সেই আগ্নেয়াস্ত্রটি নেই। বদলে জায়গা নিয়েছে ক্যামেরা। অবশ্যই সেটি আমেরিকার তৈরি। কিন্তু এখন সেই ক্যামেরা বিপ্লবেরই হাতিয়ার। বুর্জোয়া সমাজ ও বিজ্ঞান যে আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার



করে সেগুলো ব্যবহার করার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে বলে মনে করেন আলেয়া। তার কাছে প্রথম বিবেচনার বিষয় হল কার বিরুদ্ধে বা কার পক্ষে সেটি ব্যবহার করা হচ্ছে ?

টমাস আলেয়া আজন্ম বিপ্লবী। কথার প্রতিটি শব্দ নির্বাচনে তাই বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ। তিনি বললেন, আমাদের কিউবান সিনেমা সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, সমস্যাকেই তুলে ধরে তবে কখনই প্রতি-বিপ্লবী কথা বলতে পারে না।

সরকারী আইন কানুনের সমালোচনা ?

হ্যাঁ, তাও করা যায়। কোন বাধা নেই, কিন্তু বিধ্বংসী কোন বক্তব্য রাখা যায় না। ওদেশে চলতি অর্থে কোন সেনসর প্রথা নেই, কিন্তু সিনেমা ব্যবসা যেহেতু সরকারের মুঠোয় সেখানে পুরো স্বাধীনতা নিয়ে অবশ্যই কাজ করা সম্ভব নয়। অন্তত বুর্জোয়াবাদে বিশ্বাসী কারও পক্ষে অসম্ভব।

টমাস আলেয়া ছবি শুরু করেছেন কুড়ি বছর বয়সে। নেস্তর আলমেন্দ্রস এর সঙ্গে যুগ্ম পরিচালক হয়ে ১৯৫৮ প্রথম ছবি করেন। নাম 'উনা কনফিউসন কোতিদিনা।'

ফিলম নিয়ে পড়াশুনো করেছেন রোমে, তারপর দেশে ফিরে আবার ছবি করা শুরু। ১৯৬১তে 'হিস্টরি অফ রেভ্যুলিউশন' করার

পরই তিনি এলেন প্রথম স্যারিতে। ১৯৫৯ বিপ্লব সফল হল। আর তারপরই এই ছবি তাকে এনে দিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

আলেয়ার কাছে বিপ্লবী ছবির সংজ্ঞা হল শোষণমুক্ত সমাজে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী ছবি হবে যথার্থ বিপ্লবী ছবি। এবং সেজন্যই তার ছবিতে সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনাও জায়গা পায়। ওর 'টুয়েলভ চেয়ারস' ও 'ম্যরেৎ দ্য ব্যুরোক্রাট' সরকারী আমলাতন্ত্রের ওপর দারুণ স্যাটায়ার। আর 'মেমোরিজ অফ আনডারডেভালাপমেনট' একজন কিউবান বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবোত্তর মানসিক সংকটকে বিপ্লবীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে।

ফিলমোৎসবে টমাস আলেয়ার সাম্প্রতিক ছবিটিই দেখানো হল। নাম 'দি সারভাই-ভরস।' পরিচালক বললেন—'বুর্জোয়া ভ্যালুজকে মকরি করেছি এই ছবিতে।' অথচ সাংবাদিক আসরে একজন অতিবোদ্ধা বলে উঠলেন তার মনে হয়েছে 'মার্কসিজম' কেই নাকি বিদ্রূপ করেছেন তিনি। মন্তব্য শুনে আলেয়া বললেন—'আমার বিপ্লবী চিন্তাকে নতুন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে মনে হচ্ছে।'

ভারতীয় ছবি সম্পর্কে তার ধারণা খুবই ফ্যাকাসে। কম ছবিই দেখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের কয়েকটা মাত্র। এবারে দেখলেন দু-একটা। কিন্তু মন্তব্য করার পক্ষে এই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়। তিনি শুধু বললেন—'আপনাদের সঙ্গে আমাদের ছবি তৈরির বেসিক্যাল পার্থক্যটাই আসল।'

কিউবায় এখনও বছরে আট-দশটার বেশি ছবি হয় না। অবশ্যই ছবিগুলো মনে রাখার মত। নেহাৎ ব্যবসা করার জন্যতো ওখানে ছবি হয় না। সামাজিক একটা উদ্দেশ্যও থাকে। এখন টমাস আলেয়া কিউবার সিনেমার এক নমবর মানুষ। সবাই শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। ব্যাঙ্গালোরেও শ্রদ্ধা-ভালোবাসা কুড়িয়ে গেলেন।

দু রকম স্ক্রিপট বানাই ঃ কাইনে

বিশেষ প্রতিনিধি



ভারতের ছবি সম্পর্কে মজাদার মন্তব্য করেছেন ইজিপটের প্রখ্যাত পরিচালক ইউসুফ কাইনে। তিনি বলেছেন—'আপনাদের দেশে এত ভাষা, এত সংস্কৃতির মিশ্রণ যে আলাদা করে ভারতের ছবি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারছি না। বাংলা এবং কান্নাড়ি ছবি কিছু দেখেছি। সেটাই যদি ভারতের ছবির স্ট্যানডার্ড হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আশাপ্রদ।'

কাইনের অভিযোগ ছিল 'আপনাদের বেশির ভাগ ছবির সাবটাইটেল নেই কেন ?'

তিনি আরও জানালেন—মিশর ভারত থেকে শুধু আফিং মার্কা ছবিই কেনে, যারা সিরিয়স ফিলম দেখতে চায় তাদের ওদেশে সুযোগ প্রায় নেই-ই।

মিশরের ফিলমের ব্যবসা অবশ্যই পুঁজি-বাদকেন্দ্রিক। ছবিতে যারা টাকা লগ্নি করেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য লাভ করা। এই অবস্থার মধ্যেই কাইনে নিজের মনমত ছবি করতে পারছেন। সেনসর বোর্ডের লালচোখ সব সময় তার দিকে পড়ে আছে। ছবি তৈরির আগে চিত্রনাট্য দাখিল করতে হয় সেই বোর্ডকে।

কাইনে 'চুপিচুপি বললেন—'অনেক সময়ই দুরকম স্ক্রিপট করে রাখি। একটা বোর্ডকে দিই, অন্যটা নিয়ে কাজ করি।' ঐ বোর্ডের বিরুদ্ধে তার আসল ক্ষোভ হল—'কমিটির অধিকাংশ মেমবার জানে না ফিলম কিভাবে হয়। ফিলমের অ-আ-ক-খ তারা বোঝেন না। সামরিক বিভাগের এক মেজর হয়ত বসে আছেন মাথায়। এদের দিয়ে কি কাজকর্ম চলে ? অন্তত শিল্পসৃষ্টিতো নয়ই।'

একবার ওখানকার সংস্কৃতি মন্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন 'মিলিটারীরা যেমন ট্যাঙ্ক নিয়ে ফ্রনটে যুদ্ধ করছে আমাকেও আমার ক্যামেরা নিয়ে আমার ফ্রনটে আমার যুদ্ধ করার স্বাধীনতা দিন।'

তখন থেকেই কাইনেকে আর কেউ তেমন ঘাঁটাতে সাহস পাননি। তার ছবি দেশে পয়সা না পেলেও বিদেশের বাজারে দর পায়। কাইনের সাফল্য ঐখানেই।

তিনি নিজেকে মনেপ্রাণে সমাজবাদী বলে মনে করেন। ক্যামেরা তার হাতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতিয়ার। এতবড় শক্তিশালী গণ-মাধ্যম আর নেই। কাইনে শুধু ছবি করেই ক্ষান্ত নন। দেশ বিদেশে প্রচুর ঘুরেছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘরোয়া ভাবে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতে পারলে তিনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে পারেন।

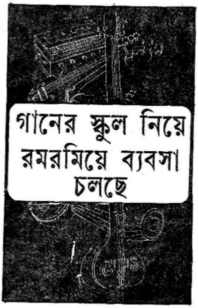
ব্যাঙ্গালোরের ফিলমোৎসবে তার ছবির রেট্রোসপেক্টিভ হওয়ায় তিনি অবশ্যই খুশি। এই প্রথম ভারতে তার ছবি ব্যাপকভাবে দেখানো হয়। সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধা করেন। সুযোগ পেলে ছবিতো দেখেনই। ব্যাঙ্গালোরেও দুখানা দেখেছেন।

আরবের ছবি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন—'আমাদের ওখানে আফিং মার্কা ছবির মওকা সব থেকে বেশি।' বছরে খান তিরিশেক ছবির মধ্যে এখন নাকি চার/পাঁচটা রাজনৈতিক ছবি হচ্ছে।

কাইনে এই মুভমেনটের প্রতি খুবই আশাবাদী। তরুণ পরিচালকরা লোভী প্রযোজকদের জ্বালায় এগিয়ে আসতে পারছে না বটে, কিন্তু সালাহ আবু সইফ, তেফুক সালাহ প্রমুখ কয়েক জনের কাজে তিনি খুবই সন্তুষ্ট।

সরকারী সাহায্য পেলে হয়ত আরও অনেকে আসবেন। কিন্তু সে আশা দূর অস্ত। ভারতে কোন ছবি করার পরিকল্পনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে কাইনে বললেন—'না, আপাতত নেই। আমি এখন আরব দেশকেই ভাল করে বুঝতে পারিনি। আরবই এখনও আমার মাথার ওপরে।'





গানের স্কুল নিয়ে রমরমিয়ে ব্যবসা চলছে

অর্জুন পাঠক

প্রসঙ্গ গানবাজনা। ঠিক গানবাজনা বলতে যা বোঝায় তা নয়। ব্যবসা বলতে যা বোঝায় সেটাও এর সঙ্গে যুক্ত। ফাইন আর্টস নিয়ে ব্যবসা অবাঞ্ছিত হলেও অপরিহার্য—তার প্রমাণ কলকাতা।

আসলে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই, ঠিকভাবে বলতে গেলে তারও কিছু আগেই, আমাদের নৈতিক ভাবনা এবং সামাজিক মূল্যবোধের ভিতটায় ফাটল ধরতে শুরু করে। যার ফলে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক চেতনার পুরনো ধ্যান ধারণাও পালটাতে থাকে ধীরে ধীরে। এই পরিবর্তিত চেহারাটা যখন ধরা পড়লো তখন আমরা নতুন রাস্তা ধরে অনেকটা চলে এসেছি। অনেক কিছুই নতুন ঠেকলো আমাদের কাছে। যেমন 'জেনারেশন গ্যাপ' শব্দটা শিখলাম। চোখে দেখলাম, অনুভব করলাম শব্দটার মর্মার্থ। এই 'জেনারেশন গ্যাপ' আমাদের সামাজিক বোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার ওপর পরিবর্তনের জোয়ার নিয়ে এলো। যার একটা ফল হল সাংস্কৃতিক ব্যবসা। যা নিয়ে আজ অনেক সাংস্কৃতিক মানুষ বেঁচে আছেন, তৈরি করছেন অনেক সাংস্কৃতিক তরুণ-তরুণী।

সাংস্কৃতিক ব্যবসা বলতে এখানে গান-বাজনার স্কুল নিয়ে ব্যবসার কথাই বলছি। যার থেকে বোঝা যাবে ধরা যাবে কিছু মানুষের নৈতিক শ্রীহীনতা। এইসব মানুষরা আমাদের খুবই কাছের। এদের চিন্তা আজকের সাঙ্গীতিক পরিবেশ, আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত চর্চা। আর সেজন্যেই এরা গানবাজনার স্কুল গড়ছেন, সঙ্গীত সম্মেলন করছেন, অন্য প্রদেশের ডিপলোমা কিনছেন—কত কি?

একটু যদি পিছিয়ে যাই—এই ১৯৫৫-৫৬ সালের কথাই ভাবি, দেখবো কলকাতার গান-বাজনার পুরো ব্যাপারটাই ছিলো অন্যরকম। তখন গানবাজনা হতো গানবাজনার জন্যেই। গানবাজনা শিখতো যাতে গাইতে বাজাতে পারা যায় সেজন্যেই। আর যারা শেখাতেন তারাও জানতেন সুরটাই আসল—বেসুরে বেতালে মজা নেই, আনন্দ নেই। আর ঐ দশকে যেসব শিল্পীকে আমরা পেয়েছিলাম নান্দনিক ভাবনায় তাদের কাছাকাছি যাওয়ারও ক্ষমতা অর্জন করিনি। তাদের প্রত্যয়বাহী কোন উত্তরসূরী আজ আর চোখে পড়ছে না। —তবে কি আমরা বলব গান-বাজনার চর্চা কমে গেছে?

আদৌ না।

ঘরে ঘরে গানবাজনার রেওয়াজ। পাড়ার অলিতে গলিতে গণ্ডায় গণ্ডায় গানবাজনার স্কুল। প্রভাকর, বিশারদ, সুধাকর, গুণাকরের ছড়াছড়ি।

তবে অভাবটা কী? সুরের জগতে এ নৈরাশ্য কেন?

এর উত্তর পেতে হলে যেতে হবে- অনেক গভীরে। সে বিশ্লেষণ ব্যাপক এবং বহুধা। অতএব সে কথা থাক। আপাতত যা, বলছি।

গড়িয়া থেকে বেলঘরিয়া, এদিকে বেলেঘাটা থেকে বেহালা। কলকাতার এই চৌহদ্দীটুকুর মধ্যে গান বাজনার স্কুলের সংখ্যা প্রায় আট হাজার।

আসলে কলকাতায় এমন কোন এলাকা মিলবে না যেখানে একটাও গানের স্কুল নেই। এক একটা এলাকায় তো দু-দশ পা অন্তর 'এখানে যত্ন সহকারে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়'—সাইনবোর্ড ঝুলছে। তলায় আছে লখনৌ, এলাহাবাদ অথবা চণ্ডীগড়ের টোপ।

মাসটার?

পাড়ার দাদা। যিনি মাস কয়েক অমুক বাবুর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন, অমুক ওস্তাদের কাছে খেয়ালের তালিম নিয়েছেন, এদিক সেদিক দু-একটা জলসায় গান-গেয়েছেন। কিংবা ওস্তাদ অমুক সেতারীর নাতি—সেতার বাজাতে না পারলেও গান শেখানোয় বাধা কি? এরা জানে এদের গান শুনে কেউ টাকা দেবে না। সুতরাং গান শিখিয়েই টাকা আদায় করতে হবে। পাড়ার মাসি. বৌদি, দিদিরা আছেই। তাদের ছেলেমেয়েদের জড়ো করে স-র-গ-ম শুরু হয়ে যায়, 'মায়াবন বিহারিণী' শোনা যায়। গোড়ার দিকে একবার জমাতে পারলে আর চিন্তা নেই। তারপর চুটিয়ে ব্যবসা। হাতের প্যাঞ্জা এলাহাবাদ তো আছেই।

এরা তো একটু আধটু গান-টান শিখে স্কুল চালায়। গানবাজনার ধার দিয়েই যায় না, কিন্তু গানের স্কুল খুলে বসে আছে—এমন মানুষও কম নেই, কয়েকজন মাসটার ঠিক করে নিলেই হল।

আসলে নামমাত্র ইনভেসটমেনটেই একটা স্কুল খোলা যায়। বাড়িতে যদি দুটো হারমোনিয়াম একটা তানপুরা থাকে তাহলে খরচা আরো কম। দ্বিতীয়ত; ধান্দাবাজি ফাক্কিকারি যতই করুন না কেউ কিছু বলবে না। উলটে অনেকে সমীহ করবে। সংস্কৃতি-সম্পন্ন কৃষ্টিবান মানুষ বলে খাতির করবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবে গান শেখাতে। ব্যবসাও জমে উঠবে।

এই ধরনের একজন সংগীত চূড়ামণির কথা শুনুন। প্রৌঢ় এই ভদ্রলোকটির গান কখনও শুনিনি, আদৌ গাইতে পারেন কিনা জানি না। কিন্তু মুখে অনবরত সংস্কৃত শ্লোক আর নানা রাগের বিশ্লেষণ শুনে মনে হবে কতোবড় পণ্ডিত! প্রচলিত রাগরাগিণী নিয়ে উনি বড় একটা ভাবেন না—ওসব প্র্যাকটিস করে দেখেছেন ঠিক রাস্তায় নেই। তাই নিজেই রাগরাগিণীর জন্ম দিচ্ছেন।



শোনা গেল ইতিমধ্যে ভদ্রলোক সাতাশটা কানাড়ার জন্ম দিয়েছেন। চেহারায় অসম্ভব সাত্ত্বিক। গলায় উপবীত আর রুদ্রাক্ষের মালা—তন্ত্র-মতে বিশ্বাসী তো। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। বুদ্ধের দেশ থেকে এখানেই এসে বুদ্ধত্ব পেয়েছেন। নামের পেছনে অনেক উপাধী থাকলেও তাই কোনটা ব্যবহার করেন না—এসবে অনাসক্তি। জীবনের প্রায় সবই ত্যাগ করেছেন 'কেবল সংগীত শিকসা দেনে কে লিয়ে।' শুধু লোভ আর কাম এই দুটোই আজ সম্বল। তবে ইনি অনেক চাবিকাঠির মালিক; এলাহাবাদের ডিপলোমার মূল এজেনট ইনি; এর সদয় হাসিতে মুক্তো না ঝরলেও প্রভাকর, প্রবীণ ডিপলোমা ঝরে। পশ্চিমবঙ্গে এলাহাবাদের কেন্দ্রগুলি চলে ওর পরামর্শে। ছাত্র-ছাত্রীরা হুড়মুড় করে পায়ে পড়ে সেজন্য। নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। বেশি মেয়েকে শেখান না। যাদের শেখান তাদের প্রথম তালিম হচ্ছে 'গুরুকো সেবা বিনা কুছ নেহি হোগা।' সত্যি তো! উপচার এলো। কিন্তু সুরলক্ষ্মী এতো অল্পে তো কণ্ঠে আসে না। সঙ্গীত অনেক সাধনার ধন। সাধনার দ্বিতীয় স্তরের তালিম 'পহলে ভোগ পিছে যোগ—অউর বিনা ভোগ সে সুর নেহি মিলে।' গুরুকে ছাত্রীদের নিবেদন করতেই হয়। এই গুরুর সেবায় এবং ভোগে যে যে ছাত্রী সন্তুষ্ট করতে পারে তাদের ভাগ্য-লক্ষ্মীও সন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন, প্রভাকর প্রবীণের সার্টিফিকেট চলে আসে। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে দামী ফ্ল্যাটে ইনি বহাল তবিয়তে কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কিছু বলতে সাহস পান না। কেননা অনেক অনেক সঙ্গীত সম্মেলনের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে যুক্ত। যুক্ত আছেন আকাশবাণীর অডিশন বোর্ডে। ইচ্ছে করলেই দু' একজনকে পাশ করিয়ে দিতে পারেন,—কয়েকটা সম্মেলনের ডায়াস পাইয়ে দেওয়াটা এর কিছুই নয়। অতএব 'মা বদ'।

এর কাছ থেকে বলে নয়—এই রকম মাসটার মশাইদের হাত থেকে কিংবা এরা যেসব স্কুল চালান সেখান থেকে এমন কোন ছেলেমেয়ে খুঁজে পাবেন না যাকে শিল্পী বলা চলে। এদের কারবারের ফিনিসড প্রোডাকটের নাম 'সঙ্গীত-অজ্ঞ'।

এই 'সংগীত-অজ্ঞরাই' আবার নতুন স্কুল খুলছে। ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করছে। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ফাঁপা। আসলে চলতি শতকের সত্তর দশকটাই দাঁড়িয়ে ছিল এমনি এক মিথ্যে প্রতিবিম্বর ওপরে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনবোধ থেকে বিদায় নিয়েছে স্থির প্রত্যয় আর ভালবাসা। শিল্পের নান্দনিক সৌন্দর্য তার অনুভূতি বয়ঃসন্ধিক্ষণের বৃত্তের মধ্যে থিতিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। প্রগতির চিহ্ন কী না জানি না তবে এটা আমাদের অন্দরমহলের অবক্ষয়েরই সূচনা। আসলে আমাদের জীবনবোধের মূল্য গেছে কমে। তাই সামাজিক চেতনা থেকে শৈল্পিক সৌন্দর্যের মানবিক আবেদনটাও গেছে কমে। এখন সৃষ্টির আনন্দের উল্লাস নেই আছে সৃষ্ট প্রেক্ষাপটের ওপর বিলাসের আনন্দ।

আর, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে কিছু ঘুণ ধরা মানুষ। গাইতে বাজাতে পারেন—আছে কিছু তাত্ত্বিক কনসেপশন। যা নিয়ে এরা জলসায় জলসায় ঘুরে বেড়ান—সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। কার গলা ঠিক সুরে বলেনি, কার পুরীয়ার ধৈবত মাড়োয়ার মতো বলছিল। যোগীয়া আর ভৈঁরোর রেখাবে এরা বিস্তর ফারাক দেখেন যা শিল্পীরা চিন্তাই করেন না। এই রকম এক সংগীত আচার্যর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম—ঠিক আছে যোগীয়া আর ভৈ'রোর রেখাবের তফাৎটা গেয়ে বুঝিয়ে দিন তো। অনেক কসরৎ করে যোগীয়া আর ভৈ'রোর রেখাব শোনালেন। বার বার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি? বুঝতে পারলেন তো?' লজ্জায় মাথা খেয়ে ঘাড় কাৎ করেছি। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই ওর কণ্ঠে এই শ্রুতির তফাৎ কিছু পাইনি। সঙ্গীত প্রভাকর সঙ্গীত প্রবীণ-এর উনি একজন পরীক্ষক।

এলাহাবাদের প্রয়াগ সংগীত সমিতির প্রভাকর, প্রবীণ ইত্যাদির ব্যাপারে বেশ কিছু-দিন থেকেই চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়ে আছে সঙ্গীত মহলে। অজস্র অভিযোগ। সে কথায় পরে আসছি। শিল্পীরা এসব নিয়ে এগোতে চান না—অতো সময়ও নেই, আর ঝামেলার থেকে দূরে থাকাই ভালো। শিল্পের বেসাতি কয়েকজন এই বিশারদ, প্রভাকর প্রবীণ-এর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে পিছিয়ে এলেন। কেন না এলাহাবাদের দরজায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন সঙ্গীতপ্রাজ্ঞ এজেনট। এই এজেনটের থ্রু দিয়ে না গেলে তারা গুজবে কান দেন না। তারা তাই নিজেরাই এর বিকল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে এগিয়ে এলেন। একটা নয়, কয়েক বছরের মধ্যে তিন-চারটে প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিলেন ওই সুর-ব্যবসায়ী ভদ্রলোকেরা। যেখান থেকে সঙ্গীত সুধাকর, সঙ্গীত বিভাকর, সঙ্গীত-গুণাকর ইত্যাদি ডিপলোমা দেওয়া হচ্ছে।

এদের সকলেরই মূল লক্ষ্য এক। বছরে বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে কয়েক লাখ টাকা এলাহাবাদে যাচ্ছে তার একটা বিহিত করা। এলাহাবাদে ডিপলোমার বদলে এখান থেকেই ডিপলোমা দিয়ে টাকাটা নিজের প্রদেশেই রাখা। কিন্তু তা হবে কি করে? ব্যক্তিগত স্বার্থ আমাদের আগে. তারপর সমষ্টিগত চিন্তা। আর এসব প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ কর্ণধারই নীতিহীনতায় ভুগছেন।

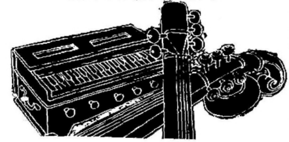
যেমন, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক, যার প্রতিষ্ঠানের শাখা মালদা থেকে আসাম পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। ভদ্রলোক বেশ জমাটি, তেমনি চটপটে। হাসি হাসি মুখ। কারুকে আপন করতে সময় লাগে না। প্রয়োজনে বিনয়ী অন্যথায় পণ্ডিতম্মন্য।

গানবাজনার জগতে ঘুরে বেড়ান। ওর এক আত্মীয় আবার ক্লাসিকাল গানে নাম করেছেন। অতএব পরিচিতির পৃথিবীটা একটু ব্যাপক। এলাহাবাদের এই সব অনাচার তিনি সহ্য করতে না পেরে একটা সঙ্গীত সমাজ খুলে ফেললেন। দক্ষ অর্গানাইজার। স্যাকারিনের শিশি পকেটে নিয়ে রে রে করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নামী দামী শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাকে যেভাবে রাখলে ওর সমাজ তাড়াতাড়ি বাড়তে পারবে তাকে সেই পদে বৃত করলেন। সমাজের সর্বোচ্চ পদের জন্যে ছুটে এসে পায়ে পড়লেন

এমন একজন সাধক সুরশিল্পীর কাছে যার নামে তামাম দেশের শিল্পীরা আজও মাথা নোয়ান।

তার জীবনের শেষদিকে ভদ্রলোকের আর্বিভাব। অমায়িক ব্যবহারে দুদিনেই তিনি সঙ্গীতাচার্যের একান্ত শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠলেন। সর্বক্ষণ তার কাছে কাছে। শিল্পীর গানের স্টাইল বিশেষ করে তার তানের বাহারি ছব্বা, সরগমের বৈশিষ্ট্য তিনি চলে যাওয়ার পরেও হারিয়ে না যায় এজন্য অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দিনের পর দিন সব লিখে রাখলেন। মাত্র কিছুদিন আগে সেই তান সরগমের বই বাজারে বেরিয়েছে—লেখক, ভদ্রলোক নিজেই। ওর তৈরি ডিপলোমার অবশ্য পাঠ্যক্রম হিসেবে। সুর সাধক সেই শিল্পী আজ ভাগ্যিস বেঁচে নেই!

গান বাজনার জগতে এ-রকম মানুষই বেশি। নৌকার হাল ধরে আছেন এরাই। ভাল মানুষ বলতে যা বোঝায় সংখ্যায় তারা এতো অল্প যে হালে প্যানি পান না।



॥ ২ ॥

গানবাজনার স্কুলগুলোর পরিচালনার ব্যাপারে একটা বাঁধা ছক আছে। যেমন:

মাথার ওপরে পরিচালক বা কার্য-নির্বাহক সমিতি। যাদের কিছু করার নেই, কোনও দায়দায়িত্বও নেই। তারপর মালিক বা সেক্রেটারি। ইনি একটু-আধটু যদি গান বাজনা শিখে থাকেন তাহলে ইনিই প্রধান শিক্ষক। নাহলে সে রকম প্রবীণ ব্যক্তিকে ওই পদে রাখা হয়। এরপর শিক্ষকমণ্ডলী —নাচ. গান, সেতার, সরোদ, গীটার, তবলা ইত্যাদি।

মাত্র-কয়েকটি স্কুল ছাড়া বাকি সব স্কুলেই শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটা মর্জি মাফিক। 'প্রভাকর' বিশারদের ছাপ থাকলেই পাড়ায় একটা সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দেওয়া চলে। তারপর আমার চেনাজানা এমন বন্ধু-বান্ধব ধরে আনেবো যারা কোন না কোন গান বা যন্ত্র একটু শিখেছে। শিক্ষক হিসেবে এরা থাকলেন—ওপরে আমি 'প্রভাকর' প্রধান শিক্ষক। আর এই চেনা জানা সঙ্গীত-অজ্ঞদের ধরে আনার কারণই হচ্ছে—মাইনে।

শতকরা আটানব্বইটা গানের স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় কমিশনের ভিত্তিতে—নির্দিষ্ট বেতনে নয়। কমিশনের হার এক এক স্কুলে এক এক রকম। ১৫ টাকা মাইনে, তো ৫ টাকা স্কুল তহবিলে, ১০ টাকা শিক্ষকের পকেটে। এটা যদি ফার্সট ইয়ারের মাইনে হয়, সেকেনড ইয়ারের লাইনে এর চেয়ে বেশি। কমিশনের হারও বেশি। ফলে যার ক্লাসে যত ছাত্র-ছাত্রী তার তত আয়। ফলে সকলেই সচেষ্ট হয় তার ক্লাশ ভরাট করতে। সাধারণত এই শিক্ষকরা জানেন যে তার বাড়িতে এসে বেশি টাকায় শেখবার ছেলেমেয়ে পাবেন না—আর বাড়িতে গিয়ে শেখাতে গেলে পড়তায় পোষাবে না। অতএব এটাই ভাল।

আবার ব্যতিক্রমও আছে। নামী কয়েকটা স্কুলে নামী এবং জনপ্রিয় শিল্পীকে শিক্ষক হিসেবে রাখা হয়েছে। হিসেবটা এখানেও কমিশন। স্কুলের লাভ এতে অনেক বেশি। ব্যানারে শিল্পীর নাম দেখেই মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে। অভিভাবকরা ছুটে যান খোঁজ নিতে। সপ্তাহে তো একদিন ক্লাস। তার ফাসট ইয়ার সেকেনড ইয়ার, থার্ড ইয়ার—এইভাবে সময় বেঁধে দেওয়া আছে। অথচ শিক্ষার্থীর সংখ্যা এদের ক্লাসে এমনভাবে বেড়ে যায় যে শিক্ষকের অবস্থা কাহিল। সব ইয়ারের ক্লাসেই তিলমাত্র জায়গা থাকে না। অনেক সময় এসব শিক্ষকরা শেষে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেন, তার ক্লাসে যেন আর কোন ছাত্রছাত্রী না পাঠান।

এর ফলে স্কুলের ব্যবসা ফেঁপে যায় এবং যাচ্ছেও ঠিকই। কিন্তু যারা শিখতে আসে অনেকেই আশাভঙ্গে খেই হারিয়ে ফেলে। কেননা ব্যক্তিগত নজর দেওয়া তো তখন সেইসব শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। জনপ্রিয় শিল্পীকে ট্রেনার হিসেবে রাখলে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে আর এক অসুবিধের মধ্যে পড়েন সেটা হল—এদের প্রোগ্রাম লেগেই থাকে, রেকর্ডিং থাকে, ফিলম থাকে, শরীর একটু খারাপ মনে হলে এরা বেরোন না—এ রকম নানা পরিস্থিতেতে এরা ক্লাস নেন না। ফলে তালিম হয় কদিন?

অভিভাবকরা তো সেটা দেখেন না। তারা দেখেন মেয়ে শিখছে অমুকবাবুর কাছে। সোসাইটিতে স্ট্যাটাস বজায় রাখতে হয়; বলতে হয় বালীগঞ্জের অমুক স্কুলে।

সাধারণত একটা গানের স্কুলে আয় কত? গড়ে যদি একটা স্কুলে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে এবং মাইনে গড়ে ১০ টাকা হয় তাহলে গড় আয় ১০০০ টাকা। যদি ৭০০ টাকাও বিভিন্ন খাতে খরচ হয় তাহলেও লাভ ৩০০ টাকা।

কলকাতার একটা নামী স্কুলের গড় মাসিক আয় শুনলে চক্ষুঃস্থির হয়ে যাবে। এই স্কুলের চারটে ব্রানচ আছে উত্তর দক্ষিণ আর মধ্য কলকাতায়। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনহাজার, ছেলেমেয়েদের গড় মাইনে যদি ১৫ টাকা করেও হয় তাহলে প্রত্যেক মাসে স্কুলে জমা পড়ছে ৫২,৫০০ টাকা। সব খরচ বাদ দিয়েও মাসে যদি ৫০০০ টাকাও থাকে মন্দ কি?

বড়লোকদের সোসাইটি ধরনের একটা স্কুলের কথা বলি। ল্যানসডাউন রোডে খুব অভিজাত অঞ্চলে এই স্কুল। খুব নামী ট্রেনার সব আছেন। সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরা এখানে স্থান পায় না। শিক্ষার্থীদের বাহ্যিক আড়ম্বরের সঙ্গে পাল্লা দেয়া কঠিন। তার ওপর স্কুল পরিচালিকার সুনজরে পড়তে হলে একটা স্ট্যাটাস তো দরকারই!—এ স্কুলের আড়ম্বরও বেশি। এখানে এয়ারকনডিশনড সাউনডপ্রুফ রেকর্ডিং রুম আছে। যেখানে স্টিরিওফোনিক সিসটেমে গান রেকর্ড করে লাইব্রেরিতে জমা থাকে। অনেক বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের গানবাজনা এভাবে এখানে ধরা আছে। ছাত্রছাত্রীদের এসব রেকর্ড মাঝে মাঝে বাজিয়ে শোনানো হয়। ভালো রেওয়াজ করতে পারলে সেরকম ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেনড দেওয়া হয়। সব থেকে বড় কথা কৃতি প্রবীণ একজন শিল্পীকে (অবশ্যই এটা পরিচালিকার ইচ্ছামাফিক) প্রতিবছর প্রায় হাজার এগারোটাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হয় তার প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে।

এ স্কুলের সব ব্যাপারটা কেমন যেন চোখ ধাঁধানো। অথচ শোনা যায় এই স্কুলের যাবতীয় পরিকল্পনা একজন ধনী শিল্প-রসিক পুরুষের। তাকে যেভাবেই হোক বুঝিয়ে সুঝিয়ে পরিচালিকা ভদ্রমহিলা বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ স্কুল ফানডের জন্য পেয়ে যান। শিল্পরসিক পুরুষটি আজ বেঁচে নেই। তাই সঠিক তথ্য কেউ জানেনা। তবে অর্থ সাচ্ছল্যের দিক থেকে সদ্যোজাত এই স্কুলটি অনেককেই টেক্কা দিয়েছে।

ট্রেনার ছাড়াও ওসব স্কুলে বেতনভুক বিভিন্ন পদের কর্মচারী আছে—আছে বেয়ারা, দারোয়ান, গাড়ির ড্রাইভার। বছরে পুজো বোনাসও এদের বরাদ্দ।

কোন ব্যাপারই হেয় করছিনা। কেননা এরা যা করছেন সবই সঙ্গীতের জন্য। কিন্তু কোনটাই কাজে লাগছে না। গান বাজনা বাদ দিয়ে বাকি সব হচ্ছে। আদর্শ বলতে এদের কিছু নেই—কিন্তু আদর্শের বড় বড় বুলি আছে।

এমনি আদর্শবান সঙ্গীতপ্রাণ আর একজন মানুষের কথা না বলে পারছি না।



ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের জন্যে নিবেদিত-



	প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি (এলাহাবাদ)	প্রাচীন কলাকেন্দ্র (চণ্ডীগড়)	ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যাবিহার (কলকাতা)	বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ)	সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ (কলকাতা)
			প্রথম বর্ষ		
স্বরজ্ঞান	সাত শুদ্ধ/পাঁচ বিকৃত স্বরের পরিচয় ও অভ্যাস	শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের পরিচয়	স্বর শুনিয়া রাগ চিনিবার ক্ষমতা এবং শুদ্ধ বিকৃত স্বরের পার্থক্য	সাত শুদ্ধ ও পাঁচ বিকৃত স্বরের পরিচয়	×
পরিভাষা	নাদ, শ্রুতি, স্বর, প্রাকৃত স্বর, শুদ্ধ স্বর, ধ্বনির উৎপত্তি ইত্যাদি।	← ঐ	← ঐ	← ঐ	← ঐ
জীবনী	বিষ্ণুদিগম্বর ও ভাতখণ্ডে।	×	বিষ্ণুদিগম্বর ও ভাতখণ্ডে।	তানসেন, ভাতখণ্ডে ও গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।	ভাতখণ্ডে, অঘোরনাথ চক্রবর্তী ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।
ধ্রুপদ ও খেয়াল	আলাইয়া বিলাবল, ইমন, খাম্বাজ, কাফি, বেহাগ, ভৈরব, ভূপালী।	বিলাবল, ইমন, ভূপালী, খাম্বাজ, ভৈরব, বেহাগ, আশাবরী।	বিলাবল, ভূপালী, ইমন, ভৈরব, খাম্বাজ, কাফী, আশাবরী।	বিলাবল, ভূপালী, ইমন, ভৈরব, খাম্বাজ, কাফী।	আশাবরী, ভৈরব, কাফী, খাম্বাজ, ভৈরবী, বেহাগ, ইমন।
			সপ্তম বর্ষ		
রাগ	শ্যামকল্যাণ, মারু বেহাগ, নন্দ, দেবগিরি বিলাবল, ইমনি বিলাবল, মলুয়া কেদারা, বেহগড়া, খাম্বাবতী, নারায়ণী, গোরখ কল্যাণ, আহির ভৈঁরো, মেঘমল্লার, জৈত্‌শ্রী, পুরীয়াকল্যাণ, ভাটিয়ার, শুদ্ধসারং, মিঞাকী সারং, সূহা, নায়কী কানাড়া, কাফী কানাড়া, কৌশিক কানাড়া, আভোগী, সুর মল্লার, রামদাসী মল্লার, দেবগান্ধার, যোগকোষ, বিলাসখানি টোড়ি, চন্দ্রকোষ, মধুবন্তী, গুর্জরী টোড়ি।	সূহা, সুঘ্রাহী, কাফি কানাড়া, মধুবন্ত সারং, ঝিঁঝিট, পাহাড়ী, যোগকোষ, শিবরঞ্জনী, নটমল্লার, জয়ন্ত মল্লার, শিবমত ভৈঁরো, বঙ্গাল ভৈঁরো, নট বেহাগ, ললিতা গৌরী, দেব গান্ধার, চাঁদনী কেদারা, কুকুভ, সরফর্দা, রেবা ও জয়েৎ কল্যাণ।	ললিত, বিলাসখানি টোড়ি, মারুবেহাগ, চন্দ্রকোষ, শ্যামকল্যাণ, শুদ্ধসারং, নট ভৈঁরো, আহির ভৈঁরো, দরবারী কানাড়া, কৌশিক কানাড়া, মেঘমল্লার ও সুরদাসী মল্লার।	ভাটিয়ারা, বিলাসখানি টোড়িযোগ, শ্যামকল্যাণ, মারু বেহাগ, আভোগী, চন্দ্রকোষ, শুদ্ধ সারং, আহির ভৈঁরো ও কলাবতী।	আভোগী, নায়কী কানাড়া, দেবগিরি বিলাবল, নট ভৈরব, মধুবন্তী, পুরীয়া কল্যাণ, কৌশিক কানাড়া, গুহা, মেঘমল্লার, রামদাসী মল্লার, জয়েৎ, নারায়ণী, হংসকিংকীনি, ভূপাল টোড়ী ও গাহারী।
শেষ উপাধি	সঙ্গীত প্রবীণ	সঙ্গীত-ভাস্কর	সঙ্গীত-রত্নাকর	সঙ্গীত-প্রবর	সঙ্গীত-রত্ন

প্রাণ এই ভদ্রলোকটি বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে লাগলেন। বেশ কিছুদিন আগে সে উদ্দেশ্যে ঢাকুরিয়ার কাছে এক টুকরো জমিও জোগাড় করলেন। ওপর মহলের সঙ্গে তখন ওর কিছু যোগাযোগ ছিলো। সেই সুবাদে সরকারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করলেন। বেশ জাঁকিয়ে স্কুল শুরু হল। কিন্তু ভদ্রলোকের বিধি বাম। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। স্কুল স্টাফরাই তার পেছনে কাঠি নাড়লেন। সরকারী অত টাকার কোন হিসেব মিললো না।—তারা সরকারকে জানালেন—আদালত অবধি ব্যাপারটা গড়ালো। মিটমাট এখনও হয়নি। তবে ভদ্রলোককে স্কুলের মায়া কাটাতে হয়েছে।

মোদ্দা কথা যেটা আগেই বলেছি, ফাইন আর্টস নিয়ে ব্যবসা—বিশেষত গানবাজনা নিয়ে—আমাদের মাটিতে যা আগে ভাবা যেত না : এখন সেটা অনেকেরই কাম্য এবং বেশ জমাটি ব্যবসা বলেই বোধহয়। ওপরের উদাহরণগুলো কোনও কাল্পনিক কথা নয়। গানের স্কুলগুলোর শতকরা আশিভাগ চালায় ঐ ধরনের শিল্প-রসিকরা। প্রশ্ন থাকতে পারে এইসব স্কুল থেকে তবে কি ছেলেমেয়েরা কিছুই শেখে না ?

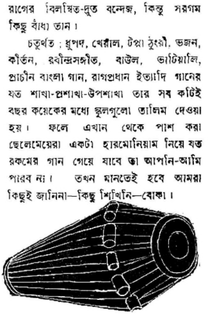
হ্যাঁ শেখে। যেমন ঃ

প্রথমত ; সুর, লয়, ছন্দ, তাল, রাগ, ইত্যাদির ঔপপত্তিক ব্যাখ্যা। কোনটাকে কি বলে। কোন রাগের বাকড় কি ? কোন-রাগের বাদী সমবাদী কি ?—ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কি শিল্পের জন্যেই যারা শিল্পী অর্থাৎ পুরো গাইয়ে বাজিয়ে অনেকেই এই তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত ; বিভিন্ন ওস্তাদের জীবনী, ঘরানা, তার শাখাপ্রশাখা। এই ধরনের জ্ঞানও এইসব স্কুলের ছেলেমেয়েদের কম নয়।

তৃতীয়ত ; কয়েক বছরের মধ্যে এরা অনেক রাগ জেনে ফেলে (যদিও কোনটাই গাইতে/বাজাতে পারে না) এবং সেইসব রাগের বিলম্বিত-দ্রুত বন্দেজ, কিন্তু সরগম কিছু বাঁধা তান।

চতুর্থত ; ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ঠুংরী, ভজন, কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালি, প্রাচীন বাংলা গান, রাগপ্রধান ইত্যাদি গানের যত শাখা-প্রশাখা-উপশাখা তার সব কটিই বছর কয়েকের মধ্যে স্কুলগুলো তালিম দেওয়া হয়। ফলে এখান থেকে পাশ করা ছেলেমেয়েরা একটা হারমোনিয়াম নিয়ে যত রকমের গান গেয়ে যাবে তা আপনি-আমি পারব না। তখন মানতেই হবে আমরা কিছুই জানিনা—কিছু শিখিনি—বোকা।



(৩)

তুলনামূলক একটা ছবি তুলে দিচ্ছি। এই বিভিন্ন পরীক্ষার সিলেবাস। শুধু ক্লাসিকাল গানের প্রথম বর্ষ আর শেষ বর্ষ এই দুটোরই ছক দিচ্ছি। এতে বোঝা যাবে বছর কয়েকের মধ্যে এক একজন সঙ্গীতের দিকপাল কেমন করে হচ্ছে। কত রাগ শেখা হচ্ছে।

ওপাতার ছকটা ফার্স্ট এবং ফাইনাল ডিপলোমার শুধু ক্লাসিকাল গানের। এটা কেবলমাত্র প্র্যাকটিকাল। থিওরিটিকালের ব্যাপার আলাদা। সেটা আর লিখলাম না।

এইটুকু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে একটা ডিপলোমাধারী ছেলে-মেয়ের রাগরূপের পরিচিতি কত ব্যাপক।—এই পরীক্ষার এটাই সবচেয়ে লাভ।

এইসব পরীক্ষার পরীক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে ফি পেয়ে থাকেন। এক একটি প্রতিষ্ঠানের ফি—এক এক রকম। যেমন ঃ

	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও রেট	প্রতিদিনের ডি-এ	যাতায়াত খরচ	আনুষঙ্গিক খরচ
প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি	৫০ জন/ ৩৫ টাকা	১৫ টাকা	পাঁচটা সেকেনড ক্লাস টিকিটের দাম	—
প্রাচীন কলা কেন্দ্র	৫০ জন/ ৪০ টাকা	১০ টাকা	চারটে সেকেনড ক্লাস টিকিটের দাম	বিল অনুযায়ী
বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ	৪০ জন/ ৩০ টাকা	১০ টাকা ও ১২ টাকা	দুটি সেকেনড ক্লাস টিকিটের দাম	ঐ
ভারতীয় সঙ্গীত	১ জন/ ১ টাঃ ও ২ টাকা	৮ টাকা	বিল অনুযায়ী	—

তবে এই পরীক্ষকরা সব সময়ে সব বিষয়ে যে পারদর্শী অর্থাৎ অলরাউনডার হবেন তেমন কোন মাথার দিব্যি নেই। যে কোন একটা বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকলেও হবে।

কয়েক বছর আগের কথা বলছি। এলাহাবাদ থেকে একজন পরীক্ষক এলেন প্রভাকর আর প্রবীণের ফাইনাল পরীক্ষা নিতে। তিনি নিজে খেয়ালের লোক। কিন্তু হেড অফিস তাঁকে পাঠিয়েছে নাচ-গান-বাজনা সবেরই পরীক্ষা নিতে। এটাই নাকি প্রয়াগের নিয়ম। যাহোক, কথক নাচের দিন ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, 'দাদা নাচের তো কিছু বুঝিনা। কোনটা পরণ, কোনটা টুকরা, কোনটা তৎকার। ঠিক হচ্ছে কি না কি করে বুঝব বলুন? তা আপনি যদি একটু বুঝিয়ে দেন, কি বলে দেন সে অনুযায়ী নম্বর দিয়ে যাব।' বুঝুন অবস্থাটা। ভদ্রলোক নেহাৎ সোজা মানুষ তাই স্বীকার করলেন। আবার এমন লোকও আসেন যিনি গোড়া থেকেই ভাব দেখান শব্দম, পদম, তিল্লানা থেকে বারণ, টুকরা আবার চৌতাল, ব্রহ্মতাল থেকে রবীন্দ্রনাথের টপ্পা কি কীর্তন অঙ্গের গান কিংবা নবপঞ্চের ওপর গান সবই উনি বোঝেন।

অথচ দেখা গেল আসলে উনি কোনটাই বোঝেন না। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো নয়ই। ওর কাছে 'আমার মল্লিকাবনে' আর 'চির দিবস নবমাধুরী' একই অঙ্গের বলে বিবেচিত। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরীক্ষাও নিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কলম তার হাতে। যার গান ভালো লাগবে অথবা মনে হবে ভালো তার ভাগ্য প্রসন্ন—'প্রবীণ' বা 'ভাস্কর' তার কপালে ঝুলবে।

পরিশেষে একটা জিজ্ঞাসা—যারা গানের স্কুল করে মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেছেন এবং ডিপলোমা দেওয়ার নামে বছরে আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা উত্তর প্রদেশে চলে যাচ্ছে আমাদের সরকার এর থেকে কতটা লাভবান হন? কোনরকম কর এই টাকা থেকে সরকার পায় না। পুরো টাকাটাই আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে। মজা হচ্ছে থোক টাকাটা একবারে যাচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঠানো টাকাটা প্রয়াগের কোষাগারে জমা হচ্ছে। এতে আমরা কি লাভবান হচ্ছি?

বলতে নেই এই এলাহাবাদ বা লখনৌতে কলকাতার কোন শিল্পী এখনও যোগ্য সমাদর পায় না। বাঙালী শিল্পীদের যোগ্য মর্যাদা দিতে তারা আজও কুণ্ঠিত। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই কয়েক লাখ টাকা ওখানে চলে যাচ্ছে এবং ভারতের আর কোনও প্রদেশ থেকে এতো টাকা এরা পায়না। পশ্চিমবঙ্গ ওদের বিরাট পকেট। পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাকা বন্ধ হয়ে গেলে প্রয়াগের অনেক কাজকর্মই নাকি অচল হয়ে যাবে। যে কারণে অন্তত এখানকার আয় ঠিক রাখতে ওরা সচেষ্ট।

এটাও যেমন একদিকের ব্যাপার তেমনি আমাদের এখানে যে কয়টি ডিপলোমা কেন্দ্র হয়েছে তারাও যে মোটামুটি আয় করেন সেটা কোনও ভালো কাজে লাগে না। সবটাই মালিকের ভবিষ্যতের নিজস্ব পরিকল্পনার খাতে থাকে।



(৪)

এ ব্যাপারে কয়েকটা পরিকল্পনা ভেবে দেখা যেতে পারে ঃ

প্রথমত, সরকারী তরফের উদ্যোগ বা সরকারকে এ ব্যাপারে সজাগ করে দিতে হবে। এলাহাবাদ, লখনৌ ও চণ্ডীগড়কে যে টাকা আমরা দিচ্ছি তার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ এখানে জমা রাখতে হবে। টাকাটা জমা থাকবে সরকারী হেফাজতে—সঙ্গীতের জন্য।

দ্বিতীয়ত; কলকাতার নামকরা বড় বড় স্কুলগুলো থেকেও কিছু টাকা বছরে সরকারী তহবিলে জমা পড়া উচিত—যা পড়েনা। প্রথমে এর জন্য সাংস্কৃতিক জগতের দু-একজনকে নিয়ে একটা কমিটি করে বলে দেওয়া দরকার—প্রথম দু' বছর এরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা সংগ্রহ করে সরকারী তহবিলে জমা দেবেন—এবং কলকাতার বড় বড় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের একটা হিসেব দাখিল করবেন। তারপর সরকার প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের কিছু অংশ নিজের কোষাগারে রাখবেন।

তৃতীয়ত; এখানকার যেসব কেন্দ্র ডিপলোমা দেওয়ার জন্যে সরকারী অনুমোদন পেয়েছে তারা তাদের লভ্যাংশের অন্তত এক-চতুর্থাংশ সরকারী তহবিলে জমা রাখবে।

চতুর্থত; সরকারী এবং বে-সরকারী যৌথ প্রয়াসে মিলিত ভাবে ঐ সঞ্চিত টাকা দিয়ে গ্রান্ট কিছু করা যেতে পারে কি না ভেবে দেখবে। এটা অবিশ্যি পরে আলোচ্য। বিস্তারিত ভাবে।

আগে প্রথম ব্যাপারগুলো যদি কার্যকর করা যায় তবেই না?

কিন্তু কথা হচ্ছে এসব নিয়ে ভাববে কে?

আর সরকারী, বে-সরকারী যে তরফেই কাজ করার জন্যে লোক নিযুক্ত হোক না কেন—কয়েক মাস পরে তাদের পেছনে আবার তদন্ত কমিটি বসাতে না হয় যেন।

এই ব্যাপারটা অবশ্য সময়-সাপেক্ষ।

তবে এই মুহূর্তে একটা কাজ করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে ঃ বড় বড় গানের স্কুলগুলো থেকে যৌথ কমিটি করে বাংলার প্রয়াত স্মরণীয় শিল্পীদের নামে কিশোর প্রতিভাদের বৃত্তি, একটা ভালো রিসারচ সেনটার, কেবলমাত্র ক্লাসিকাল গান-বাজনার জন্যে একটা ভালো প্রেক্ষাগৃহ করা যেতে পারে। এর কোনটিই এখানে নেই, এগুলির দরকার খুবই। তাছাড়া এই কমিটি আরো কিছু কাজ করতে পারে। যেমন ঃ স্মরণীয় সুরশিল্পীদের নামে সরণী, শহরের বিশেষ কয়েকটি জায়গায় ঐসব শিল্পীদের মূর্তি স্থাপন ইত্যাদি।

গান শিখিয়ে আর ডিপলোমা বিক্রী করে গানের স্কুলগুলো হাজার হাজার টাকা মুনাফা লুটছে। সে টাকার সামান্য অংশ দিয়ে সত্যিকারের একটা মহৎ এবং স্থায়ী কাজ কি করা যায় না? ★

আলোকচিত্র ঃ দীপক ভট্টাচার্য

এই পক্ষ

ফেব্রুয়ারি ১৬ থেকে ২৯

মেষ : শরীর ভাল-মন্দ মিশিয়ে চলবে। সামান্য কাটা-ছেঁড়া উপেক্ষা করবেন না। নানাভাবে সঞ্চয়ের সুযোগ আসবে। আয়বৃদ্ধির কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি নেই। কর্মস্থলে অহেতুক কোন বিষয়ে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। মেয়েদের কর্মস্থলে সম্মানহানির আশংকা। পারিবারিক ব্যাপারে দীর্ঘ দিনের কোন প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আত্মীয়স্বজনেরা কোন বিষয়ে এক হাত নেবার চেষ্টা করবে। অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে নতুন কোন ঝামেলা। ব্যবসায়ীদের আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা চলবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ।

বৃষ : শারীরিক অবস্থা মানসিক অশান্তির কারণ হবে। বুকের কোন পীড়া থেকে সাবধান। খুব একটা সঞ্চয় আশা করা যায় না, তবে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্রমশঃ উজ্জ্বল। কর্মক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে ব্যর্থতা। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন কোন উৎপাত দেখা দিতে পারে। সন্তানদের স্বাস্থ্যের অবনতি। স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে অহেতুক মনান্তর। প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্যে দেরি। ব্যবসায়ীদের আর্থিক ব্যাপার শুভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ছোটখাটো লাভ।

মিথুন : হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে। অম্বল বা অজীর্ণ দীর্ঘস্থায়ী হবার আশংকা। সঞ্চয়-ব্যয় ঘুরে ঘুরে চলবে। কর্মস্থলে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ, ভুল বোঝাবুঝি। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। মেয়েদের কর্মস্থলে কারও অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়ে মনোমালিন্য। জমি-জমা বা গৃহাদি ক্রয়-বিক্রয়ে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। স্ত্রীর রক্তপাতজনিত পীড়া। ব্যবসায়ীদের ক্ষতির আশংকা। এই লগ্নের জাতক জাতিকার আর্থিক ব্যাপার শুভ।

কর্কট : পক্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বাস্থ্যের ক্রমিক উন্নতি। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়তে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন উদ্যোগে ব্যর্থতা। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাই-বোনেদের দ্বারা অশান্তি। অবিবাহিতদের নতুন যোগাযোগ ফলপ্রসূ হওয়া মুশকিল। মেয়েদের কোন ব্যাপারে আশাভঙ্গ। আত্মীয়-স্বজনের সংগে কোন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা সমীচীন। ব্যবসায়ীদের নতুন ঝুঁকি সম্পর্কে সাবধান। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ছোটখাটো ভ্রমণ।

সিংহ : স্বাস্থ্য আশানুরূপ চলবে না। সামান্য ধরনের অসুস্থতা লেগে থাকবে। ব্যয়ের চাপ সঞ্চয়কে ক্ষীণ করবে। কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চললেও কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ ব্যাপারে সমালোচিত হবার আশংকা। পারিবারিক ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে ঝঞ্ঝাট চলতে পারে। বন্ধুদের কারও ওপর আস্থা হারাবার সম্ভাবনা। মেয়েদের বিবাহ ব্যাপারে বিলম্ব; যোগাযোগ ভেঙে যেতে পারে। স্বামী/স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার নৈরাশ্য।

কন্যা : রক্তপাত বা আঘাত বিব্রত করতে পারে। ধনভাব শুভ; সঞ্চয়ের ভাল ইংগিত। কর্মে পরিবর্তনের সম্ভাবনা। মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে শ্রম সার্থক হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে হিতৈষী কোন বন্ধুর নিষ্ক্রিয়তা নৈরাশ্য আনবে। প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে সম্মানহানি। জমি-জমা বা গৃহ/বাড়ি সম্পর্কিত মামলা দীর্ঘস্থায়ী হবে। স্বামী/স্ত্রীর যৌথ কোন প্রচেষ্টায় সাফল্য। ব্যবসায়ীদের আর্থিক ব্যাপার শুভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে বিলম্বে সাফল্য।

তুলা : সামান্য অসুস্থতা বিব্রত করতে পারে। ফোঁড়া, ব্রণ ইত্যাদি মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ধনভাব শুভ; সঞ্চয়ের প্রবল যোগ থাকলেও সঞ্চয় হবে সামান্য। কর্মস্থলে নতুন কোন চিন্তাধারা স্বীকৃতি পাবে। উল্লেখযোগ্য আয়বৃদ্ধি হলেও ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থাকবে। মেয়েদের কর্মস্থলে সামান্য কোন বিষয় জটিলতা সৃষ্টি করবে। সন্তানদের স্বাস্থ্যহানির আশংকা। মামলা/মোকদ্দমার ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ সুখের হবে না। ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যোগে বাধা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্য ভাল চলবে। পুরনো রোগের সহজ নিরাময়। অক্লেশে আয় বৃদ্ধি; ফলে উপযুক্ত সঞ্চয়। কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নিজ প্রভাব অটুট থাকবে। পুরনো শত্রুতার অবসান; জমি-জমা গৃহাদি ক্রয়/বিক্রয়ের সম্ভাবনা। বিবাহ ব্যাপারে অবিবাহিতদের নতুন ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। স্বামী/স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির অবসান। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগে ঝুঁকি না নেওয়াই উচিত। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মের নতুন যোগাযোগ।

ধনু : স্বাস্থ্য সম্পর্কে শুভাশুভ মিশ্র ফল। ধন সঞ্চয়ে বাধা; মোটামুটি সারা পক্ষ ধরেই ব্যয়ের চাপ চলবে। কর্মস্থলে প্রতিকূল পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে সামান্য আয়বৃদ্ধি। মেয়েদের কর্মস্থলে তুচ্ছ কোন বিষয়ে কারও সঙ্গে মতান্তর। প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে মেয়েদের সাবধানতা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিযোগিতামূলক কাজে অন্যের সহায়তা না নেওয়াই ভাল। ব্যবসায়ীদের সময় অশুভ; ছোটখাটো সমস্যা জটিলতার সৃষ্টি করবে। এই লগ্নের জাতক জাতিকার আধ্যাত্মিক উন্নতি।

মকর : কান-গলা-নাক সংক্রান্ত কোন রোগ দ্রুত বিপাকে ফেলতে পারে। সঞ্চয়ের চেষ্টা বৃথা। ব্যয়ের চাপ পক্ষের মাঝামাঝি বৃদ্ধি পেতে পারে। কর্মস্থলে ধৈর্য একান্ত আবশ্যক। নতুন কোন যোগাযোগ ভেবেচিন্তে গ্রহণ করলে লাভের হবে। আয়বৃদ্ধির পথে বাধা এবং ঝঞ্ঝাট। মেয়েদের কর্মস্থলে আপাতত স্থিতাবস্থা চলবে। স্ত্রী/সন্তানদের কোন কাজ মানসিক শান্তি ভংগ করবে। ব্যবসায়ীদের নতুন ঝামেলায় বিব্রত হতে হবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফল্য।

কুম্ভ : স্বাস্থ্য দুশ্চিন্তার কারণ হবে। ধনভাব পূর্বাপেক্ষা ভাল; অতএব অল্পস্বল্প সঞ্চয়। কর্মস্থলে উল্লেখযোগ্য কিছুই আপাতত আশা করা যায় না। পারিবারিক ব্যাপারে বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ না করাই ভাল। অবিবাহিতদের বিবাহ বিষয় যোগাযোগে নতুন বাধা। কোন প্রচেষ্টায় নিজের উদ্যোগে সাফল্য। ব্যবসায়ীদের আকস্মিক কোন ঝামেলা বিরাট ক্ষতি করতে পারে।

মীন : সামান্য অসুস্থতা সাময়িক বিব্রত করতে পারে। ধনবান অশুভ; ব্যয়ের মাত্রা পক্ষ জুড়েই বেশি হবে। কর্মস্থলে পরিবর্তনের ইংগিত। আশানুরূপ আয় বৃদ্ধি বর্তমানে আশা করা যায় না। মেয়েদের কর্মস্থলে উটকো ঝামেলা বিব্রত করতে পারে। স্ত্রী/সন্তানদের স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হবে। মেয়েদের কোন ঈপ্সিত বস্তুলাভে বাধা। বন্ধু/ভাই-বোনদের সংগে সম্পর্ক চিড় খেতে পারে। দূর পাল্লার ভ্রমণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার অহেতুক বিড়ম্বনা।

শ্রীভট্ট

মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রনা হ'ত,
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন?
আপনার দাঁতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন!

নতুন প্রমিস

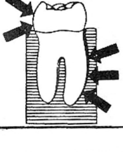
এক অদ্বিতীয় টুথপেস্ট
যাতে আছে চিরকালের ব্যবহৃত লবঙ্গের তেল!



বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক

লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট

১.
দাঁতের ক্ষয়
নিবারণ করতে
সাহায্য করে।



২.
মুখের ভেতর
তাজা রাখার দরুন
নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ
হতে দেয় না।



সুস্থ সবল দাঁত ও মাড়ি
আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে...প্রমিস!

CHAITRA-BLS-369 BEN

"কেবলমাত্র কলকাতা ও হাওড়ায় পাওয়া যাচ্ছে।"

বিশ্ব-বিচিত্রা

সবাক টাইপরাইটার

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যন্ত্র সংস্থা অন্ধদের জন্যে একরকম টাইপরাইটার তৈরি করেছে। এর একটি বোতাম টিপলে টাইপ হওয়া অংশটুকু বেজে উঠবে। এর ফলে ভুল থাকলে তা শুধরে নেওয়া যাবে। আমেরিকায় অন্ধ টাইপিস্টের সংখ্যা প্রায় ৭,৪০০। এতে এদের কর্মসংস্থানও বাড়বে। এর প্রতিটির দাম পড়বে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৮ শ' টাকা।

কুমারী মাতৃত্ব

অন্টারিওতে কুমারী মাতৃত্ব অনতি-তরুণীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়াচ্ছে। সরকারী এক প্রতিবেদনে এই সব শিশুদের 'পরিত্যক্ত ও অবাঞ্ছিত' বলা হয়েছে। ৬৩টি অব্যবসায়িক শিশু-প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে তথ্যটি প্রকাশিত। এদের মধ্যে রয়েছে ১১টি মাতৃসদন। গত দশ বছরে ষোল বা আরো কম বয়সের মেয়েদের কুমারী মাতৃত্ব নাটকীয় ভাবে বাড়ছে। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১ হাজার অনতি-তরুণী সন্তান-সম্ভবা হচ্ছে কানাডায়। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৪ এর মধ্যে সাধারণ জন্মহার হাজার প্রতি ২৩'৫ থেকে কমে ১৫'৬তে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পঞ্চদশীদের মাতৃত্বের সংখ্যা মোট মাতৃত্বের প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশি।

অনতি-তরুণী কুমারী-মায়েরা আগের তুলনায় বেশি বেশি সফল প্রসবের মধ্যে দিয়ে 'মা' হতে চাইছে। উদ্দেশ্য-মাসিক ৩০৬৩ টাকা করে প্রসূতি ভাতা লাভ। দশ বছর আগে হাসপাতালে কুমারী মায়েদের ১০ থেকে ২৫ শতাংশ 'মা' হতে চাইত। কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ থেকে ৭৫ শতাংশ। প্রতিবেদন বলছে, কুমারী-মায়েদের এই নবজাতকরা প্রায়শঃই অপুষ্ট ও অপরিণত। এই শিশুসদনগুলি সুপরিচালিত হলেও এরা যথেষ্ট সরকারী সাহায্য পায়না। ফলে অতি সাম্প্রতিককালের কুমারী মায়েদের সমস্যা সম্পর্কে এরা নতুন করে গবেষণা চালাতে পারছে না।

রাহা-খরচ

রাষ্ট্রসংঘের একটি মুখপত্রে প্রকাশিত তালিকা থেকে জানা গেছে : ওদের কর্তাদের জন্য বরাদ্দ সফর ব্যয় সৌদী আরবে সবচেয়ে বেশি, দৈনিক ১১৬১ টাকা। আয়ারল্যানডে সবচেয়ে কম, দৈনিক ২৭০ টাকা। ঐ সারণী থেকে আরও জানা গেছে : ভারতের সফর-ব্যয় কানাডার চেয়েও বেশি। ভারতের জন্যে দৈনিক ভাতা বরাদ্দ ৩৮৭ টাকা, কানাডার জন্যে ৩৫১ টাকা।

বৃক্ষ বাঁচাও

চীনে সম্প্রতি বৃক্ষ-রক্ষার এক নতুন ফরমান জারি হয়েছে। এই বৃক্ষ-বাঁচাও ফরমানে বলা হয়েছে, যদি কাউকে গাছ কাটতে, গাছ নষ্ট করতে বা, তা অবহেলা করতে দেখা যায়, তবে তাকে তিনটি নতুন বৃক্ষ-রোপণ করে তার খেসারত দিতে হবে।



রাজ-ভিখারী

ওয়াশিংটনের এই পা-কাটা ভিখিরীটির নাম এডি বারনস্টেন। গ্রীষ্মকালে সে বাঁদরের সাহায্যে ভিক্ষেয় কোন প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। আর জরাজীর্ণ একটা ঘরে বাস করে। ফুটপাতের মুষ্টিভিক্ষায় তনু-রক্ষাকারী এই এডিই আবার বছরের অন্য ৬ মাস কাঠের পা এ'টে ফ্লোরিডার প্রাকৃতিক পরিবেশে তোফা হোটেল খুলে হরদম মুনাফা লোটে। মৃত্যুর পরে জানা গেল, তার মোট সম্পত্তির মূল্য ৬২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা।

রাজ্যে রাজ্যে

বাইরে থেকে হঠাৎ নবাব

জম্মু ও কাশ্মীরের ঋষি উপত্যকাকে বলা হয় 'ঈশ্বরের উপত্যকা'। পঞ্চাশ বছর আগে এখানকার মেয়েরা স্বামী মারা যাবার পর আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে সতী হতো। এখানে কেউ মদ স্পর্শ করত না। ধর্মকর্মে মতি ছিল সাংঘাতিক রকমের। মেয়েরা জানলা দিয়েও উঁকি মারত না, ফলে তাদের দেখা ছিল দুষ্কর।

কিন্তু হায়, কালের নিয়মে সবই বদলায়। ঋষি উপত্যকারও চেহারা আমূল বদলে গেছে এই ক'বছরে।

কিন্তু কেন এমন ঘটল ? কোন বিশেষ ঘটনা ছাড়া তো আর সমাজে কোন টানা-পোড়েন হয় না।

হিমালয়ের কোলে তিন হাজার ফিট ওপরে এই ঋষি উপত্যকা। এখানে ভয়াল শতদ্রু নদীকে শাসন করার জন্যে তৈরি হচ্ছে তিনতলা কংক্রিট কাঠামোর বাঁধ। চারদিকে লোকজন ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। বিদ্যুৎ ট্রানসমিশন আর কর্মীদের বাড়িঘর। সব মিলিয়ে সে এক এলাহী কাণ্ড। এই যজ্ঞে খরচ পড়বে ২২০ কোটি টাকা।

ঈশ্বরের উপত্যকায় সব মানুষই ছিলেন গরিব। প্রায় তিনশো লোকের বাস এখানে।



তাদের কাজ ছিল মৌমাছি পালন, জঙ্গল তৈরি করা, ভেড়া চরানো, ছোটখাট চাষ-বাস করা।

কিন্তু সালাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরু হবার পর সকলেই আশা করেছিল এই সব গরিব, লোকেরাই বুঝি এই প্রকল্পে চাকরি পাবে। কিন্তু তা পায়নি।

দশ হাজার লোক এখানে কাজ করছে। এই বিরাট সংখ্যক লোককে খাবার আর আমোদপ্রমোদ দেবার জন্যে অবশ্য স্থানীয় লোকদের বেশ কিছু আয়ের পথ খুলে গেছে। যেখানকার লোকেরা মদ ছুঁতো না পর্যন্ত, সেখানে এখন মদের দোকানই খোলা হয়েছে বেশ কয়েকটা।

প্রায়ই এখন মাঝরাতে মাতালের স্খলিত কণ্ঠ, চেরা গলায় গান ভেসে আসে। আর যেখানে সতীদাহ হতো সেখানে পতিতাবৃত্তিও স্থানীয় লোকদের উপার্জনের একটা অন্যতম উপায়।

পরিবর্তন সব দিকেই আসছে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার এখানকার জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলা হচ্ছে। বাঁধ বাঁধার কাজ যত এগোচ্ছে শতদ্রু ততই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। আর সেই জন্যেই আশেপাশের বিরাট পাইন গাছ কেটে কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই ভাসমান কাঠ সমতলে নেমে এলে তাকে ধরা সহজ হচ্ছে।

বনবিভাগ এই অপচয়ে ভয় পেয়ে গেছে কিন্তু বারণ করা সত্ত্বেও কেটে ফেলা কেউ বন্ধ করছে না।

যারা নতুন এখানে বসবাস করছে এবং ব্যবসাপত্র করছে তারা বনে গেছে হঠাৎ নবাব। আর আগে থেকে যারা ভেড়া চরানো বা মৌমাছির চাষ করত, ক্ষেত খামারে কাজ করত তারা যে-কে সেই গরিবই রয়ে গেছে। ঐ হঠাৎ নবাবরা ভারী ভারী মোটর সাইকেল নিয়ে পাহাড়ী পথে যাতায়াত করে তখন স্থানীয় লোকেরা ধুলো পায়ে পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠে। এই ফারাক বাড়ছেই। আর সেকারণেই বাড়ছে ঈর্ষা, দ্বেষ আর সন্দেহ।

বিশেষ করে হঠাৎ বড়লোক বনে যাওয়া বা সালাল বাঁধে কাজ করতে আসা অধিকাংশ লোকই বাইরের হওয়ায় সংঘাতটা এখন ধিকি ধিকি জ্বলছে। এখানকার শান্তি, পুরনো ধ্যানধারণা সব বদলে দিয়েছে এরাই।

রাজ্য সরকার বা সালাল বাঁধের মালিক কেন্দ্র সরকার কেউই স্থানীয় মানুষজনকে কাজে নেওয়ার কোন ব্যবস্থাই করছে না। এখান-কার এই সব গরিব মানুষরা বলছেন, 'সালাল বাঁধের কাজ বাইরের লোকেরা করছে, বাইরের লোকেরই তাতে উপকার হবে।'

এই রকম মনোভাব টিকিয়ে থাকতে দিলে যে কোন মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে।

জেলায় জেলায়

দুপুরবেলা। আদালত তখন জমজমাট। রানাঘাট মহকুমা ম্যাজিসট্রেটের এজলাসে দাঁড়িয়ে আসামী মৃণাল বসু রানাঘাট সাব-জেলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। চোখে টসটস জল। শ্রীবসু বললেন 'আমি গতকাল থেকে অভুক্ত। কম্বল, থালা, গ্লাস ঠিকমত দেওয়া হয় না। খাবার-দাবারও কম। প্রতিবাদ করলে নানাভাবে উৎপীড়ন। অথচ পয়সা খরচ করলে জেলের ভিতরে মদ-গাঁজা পর্যন্ত পাওয়া যায়।' বিচারক তার কথা শুনে জানালেন, জেলখানা আমার এক্তিয়ারে নয়। আমি শুধু নির্দেশ দিয়ে আসামীদের জেলে পাঠাই। তাদের তদারকির দায়িত্ব মহকুমা শাসক, জেলা শাসকের। দরখাস্ত করুন। যথাস্থানে পাঠিয়ে দেব।

(চ্যালেঞ্জ/রানাঘাট)

পিয়নবিহীন অফিস। লালবাগের আর ডবলিউ এস অফিসে দীর্ঘ এক বৎসর যাবত কোন পিয়ন নেই। ঐ কাজে যিনি ছিলেন এক বছর পূর্বে তিনি প্রমোশন পাওয়ার পর ঐ পদটি শূন্যই থেকে গেছে। এতে কি সরকারী অর্থ বাঁচানো হচ্ছে, না অন্য কোন অভিসন্ধি আছে ?

(মুর্শিদাবাদ সন্দেশ/মুর্শিদাবাদ)

হুগলী জেলার উত্তরপাড়া, হিন্দ মোটর, কোন্নগর, রিষড়া রেল স্টেশনে জুয়ার আড্ডা চুটিয়ে চলছে ধারাবাহিক ভাবে। এর প্রতিরোধে জনসাধারণ অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে একবার নবগ্রাম, কোন্নগরের মানুষেরা ট্রেন চলাচল পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং জুয়া মদ এবং খুন-রাহাজানি-ছিনতাই চলবেই। (মফঃস্বল, হুগলী)

বীরভূম জেলার সকল প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণকে সরকারের পক্ষ হইতে পাঁউরুটি বিতরণ করা হয় : কিন্তু সাঁইথিয়া সারকেলের কুনুরী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঐ পাঁউরুটির পরিবর্তে গমের জাও দেওয়া হয়। জানিনা ইহা কার অদৃশ্য হস্ত। সত্বর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। (ময়ূরাক্ষী/সিউড়ি)

আসানসোল দোমহানী জামুড়িয়া রোডের অবস্থা দেখলে মনে হয় না যে এই রাস্তা মেরামতের জন্য কোন ভারপ্রাপ্ত সরকারী অফিস আছে। আগাবেগ ব্রীজ যত্রতত্র ভেঙ্গে শতছিন্ন। দোমহানী বাজার এখন একটি নদীতে পরিণত হয়েছে। তেমাথার মোড়ে বিরাট গর্ত জলে ভর্তি। পোস্ট অফিসের সামনে রাস্তার ওপর বিরাট গর্ত। সরকার রোড ট্যাকস পাচ্ছেন যথারীতি আর হয়রান হচ্ছেন এলাকাবাসী।

(মফঃস্বল বার্তা/আসানসোল)

কাঁথি শহরের অনতিদূরে কুমারপুর জনপুট রাস্তার ধারে লাইসেনসবিহীন একটি চোলাই মদের দোকান দিব্যি রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে। ওই অঞ্চল এখন মাতালদের স্বর্গরাজ্য। দিনদুপুরেও গ্রামবাসীরা ওই রাস্তা দিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কাঁথি থানায় গ্রামবাসীরা নালিশ করা সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। গ্রামবাসীদের সন্দেহ এর সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ আছে।

(মেদিনীপুর সংবাদ/মেদিনীপুর)



ছবি এঁকেছেন : জি. সান্তা

টি সি বি-তে লোকসান

সিমেনট ব্যবসায়ে টি সি বি-র লোকসানের মাত্রা বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ। গত এক বছরে এই লোকসান ২০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বস্তা প্রতি লোকসান ১০ টাকা, প্রতি টনে ২০০ টাকা।

এদিকে বিভিন্ন ব্যাংকে টি সি বি-র মোট দেনার পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা।

(দৈনিক বাংলা)

ট্রাকে আনায়

খুলনার কেন্দ্রীয় খাদ্যগুদাম থেকে নাটোর এল এস ডি-তে খাদ্যশস্য আনতে ওয়াগন পিছু খরচ ৩ হাজার টাকা। কিন্তু রেল-ওয়াগনে না এনে ট্রাকে আনায়- ফলে সমপরিমাণ খাদ্যশস্যের জন্য ভাড়া গুণতে হচ্ছে ৭ হাজার ২ শ' টাকা। রেলের বদলে ট্রাকে খাদ্য পরিবহণের জন্যে জেলা খাদ্য দফতর গত ১১ মাসে ১৪ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। (দৈনিক বাংলা)

ঋণের টাকায়

কুড়িগ্রামের রৌমারী থানায় টাকার অভাবে রোপা আমনের চাষ করতে পারেনি অনেক গরীব কৃষক। অথচ চাষের জন্য সমবায় সমিতিগুলি মোটা অংকের ঋণের টাকা পেয়েছে সরকারী তহবিল থেকে।

অভিযোগ, কৃষিঋণের টাকা কৃষকের মধ্যে বিলি না করে সে টাকায় জমজমাট ব্যবসা চালাচ্ছে কয়েকজন কর্তা ব্যক্তি।

(দৈনিক বাংলা)

শনির দৃষ্টি

কর্ণফুলী নদীর মোহনার 'আউটার বার'-এ শনির দৃষ্টি পড়েছে। শনিবার লাইটারেজ জাহাজে মাল নামাচ্ছিল 'বাংলার জয়'। কিন্তু মাল নামানো শেষ হওয়ার আগেই বিপত্তি—হঠাৎই জেনারেটর বন্ধ। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 'বাংলার জয়' টালমাটাল হয়ে চড়ায় আটকে গেল! চড়া থেকে নদীতে ভাসাতে ২৪ ঘণ্টার কসরত।

শুধু কি 'বাংলার জয়'? ঠিক এর আগের শনিবার 'আকিলি' ঠিক এখানেই আটকে ছিল চড়ায়। (দৈনিক ইত্তেফাক)

গরুর পোসটমর্টেম

ঝিনাইদহের কালিকাপুর গ্রামে গোলাম রব্বানী রাতের বেলায় তার গরুগুলিকে রেখেছিল গোয়ালঘরে। কিন্তু পরদিন সকালে ৬টি গরুকে মৃত দেখে।

সন্দেহ বিষ প্রয়োগে কে বা কারা এই গরুগুলিকে মেরে ফেলেছে। এই সন্দেহ নিরসনের জন্যেই স্থানীয় পশু চিকিৎসককে দিয়ে পোসটমর্টেম করানো হয় মৃত গরুর।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

প্রসূতি

রংপুরের আমেনা বেগম মাত্র ১৯ দিনের ব্যবধানে তিনটি সন্তান প্রসব করেছেন।

প্রথম পুত্র সন্তান প্রসবের পর কয়েকদিনের মধ্যেই আবার প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন আমেনা বেগম। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আবার প্রসব হয়। এবারে মেয়ে হয় তার। মাত্র ১৯ দিনের মাথায় আবার—মৃত সন্তান।

(দৈনিক বাংলা)

যমুনার গ্রাসে

যমুনার ভাঙনে গ্রামের পর গ্রাম বিলীন হয়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে। ইতিমধ্যেই পাবনা

ওপার বাংলা

জেলার সোহাগপুর, লক্ষ্মীপুর, রাঙ্গুয়া, মেমুল্লা গ্রামে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। তলিয়ে গেছে প্রায় ছ'শ বাড়ি, সাড়ে তিনশ' তাঁত ও শ'-দুয়েক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যমুনার গ্রাসের কবলে পড়েছে।

শুধু সোহাগপুরেই ক্ষতির পরিমাণ দেড় কোটি টাকা। তিনটি মসজিদ, একটি হাইস্কুল, একটি গার্লস স্কুলও ভাঙনের মুখে। (দৈনিক ইত্তেফাক)

ঠাঁই নাই

দেশের জেলখানাগুলিতে এখন কয়েদীদের স্থান সংকুলান সমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছে। বেশির ভাগ জেলখানার অবস্থাই অত্যন্ত জরাজীর্ণ।

মোট ৫৬টি জেলে ১৬ হাজার ৪ শ' কয়েদী রাখার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেখানে কয়েদী রয়েছে মোট ২৭ হাজার। এর মধ্যে বিচারাধীন বন্দী সংখ্যা ১৯ হাজার ৫ শ'। এদের অনেকেই ৬/৭ বছর মামলায় নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

সরকার অবশ্য ইতিমধ্যেই কারাগারের অবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন। (দৈনিক বাংলা)

সততা

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে টেসট-রিলিফের গম আত্মসাতের ঘটনা এখন কাগজ খুললেই চোখে পড়ে হামেশাই। কিন্তু এর বিপরীত ঘটনার নজির সৃষ্টি করেছেন মহিমাগঞ্জ ইউনিয়ন।

একটি মাঠ আর একটি রাস্তা মেরামতির জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল দুশ' মন গম। কিন্তু মাত্র ৫০ মনেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বাকি ১৫০ মন গম মহকুমা প্রশাসকের কাছে ফেরত নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

দর্শনে মৃত্যু

নন্দা পাড়ার দুই জেলে জবন্দু আর নেপাল দাস মাছ ধরতে জাল ফেলেছিল গাঁয়ের পাশের বিলে। যথারীতি মাছ ধরা পড়ল। ডাঙায় তুলে মাছ দেখেই সংজ্ঞাহীন জবন্দু। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরও সে ঘুম আর ভাঙেনি। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে অসুস্থ নেপাল দাসও।

৩৮ সের ওজনের বিশাল এই কাতলা মাছটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আনন্দবাজারে ৪৮০ টাকায় বিক্রি হয়! (দৈনিক ইত্তেফাক)

শিক্ষা-সংকট

আর্থিক সংকটের জন্যে মানিকগঞ্জ মহকুমার ৭টি থানার ১০টি কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। দেবেন্দ্র কলেজ, মহিলা কলেজ, তেরশ্রী কলেজ, দৌলতপুর কলেজ সহ আরও বেশ কয়েকটি কলেজে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীরা দীর্ঘদিন বেতনহীন আছেন।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা মহাদেবপুর কলেজের। টাকার অভাবে কলেজ বন্ধ। কলেজ ঘর?—ভাড়া দেওয়া হয়েছে যাত্রার মহড়ার জন্যে। (দৈনিক ইত্তেফাক)

নায়ক উবাচ

আখের গোছানোর জন্যেই প্রযোজক হয়েছি। হানড্রেড পারসেনট কমার্শিয়াল ছবি করবো। তবে নকল ছবি করবো না।
—চিত্রনায়ক আলমগীর (চিত্রালী)

ফকরুল হাসান বৈরাগী পরিচালিত
নকল ছবি 'লটেরা'তে
কানন / দৈনিক বাংলা



প্রমোদে ঢালিয়া দিনু

বাঘবাড়ি মিল্ক ভিটার কারখানায় গত পাঁচ বছরে লোকসানের অংক এককোটি টাকা ছুঁয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কর্তাব্যক্তিদের—শুধু প্রমোদ ভ্রমণের জন্যে ৮ মাসে ২৫ হাজার টাকার তেল খরচ হয়েছে! এই প্রমোদ তরণীটিকে আকস্মিক ভাবে আটক করেন জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মির্জা আবদুল আউয়াল। তাতেই এই তথ্য জানা যায়। (দৈনিক বাংলা)

অলৌকিক!

বিছানায় শুয়ে আছে চার মাসের শিশু। হঠাৎই একটি সাপ ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর। ঘরে ঢুকেই বিছানার চারদিকে ঘুরতে থাকে। মায়ের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে অন্য কেউ আসবার আগেই একটি বেড়াল ঘরে ঢুকে সাপটিকে ধরতে যায়—

কিন্তু বেড়ালের সাপ ধরার আগেই ছুটে আসে এক অপ্রকৃতিস্থ মহিলা। তার হাতেই মারা পড়ে সাপটি। সাপটিকে মেরেই উধাও হয়ে যায় সে!

ঐ দিন গভীর রাতে হঠাৎই ঘুম ভেঙে যায় মায়ের। একটা সাপকে মশারীর সঙ্গে ঝুলে থাকতে দেখে আতংকে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। তার চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় বাড়ির লোকজনের। তাদের লাঠির ঘায়ে মারা পড়ে সাপটি।

বিস্ময়ের তখনো বাকি। সকালে শিশুটিকে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়। সাপটির দেহে যত আঘাত করা হয়েছিল সমসংখ্যক আঘাতের চিহ্ন মৃত শিশুর দেহেও। আহত স্থানগুলিতে ফোসকাও পড়ে গিয়েছিল!

(দৈনিক ইত্তেফাক)

মন্ত্রশক্তি

বরগুনার আবদুল মান্নানকে হঠাৎ সাপে কামড়ায়। বিষের জ্বালায় প্রথমে বমি এবং তারপরেই বেহুঁশ। ডাক্তার বদ্যি ওঝা ঝাড়-ফুঁকে ১৩ দিন কাটলেও হুঁশ ফেরেনি মান্নানের। সকলে ধরে নিয়েছিল এ হুঁশ আর ফিরবে না।

কিন্তু সকলের সব অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বেঁচে উঠেছে আবদুল মান্নান। এবং তা ঝাড়ফুঁকেই। এই অসাধ্যসাধন করেছেন ওঝা নৃপেন্দ্রনাথ সরকার।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

প্রেম

দাদু প্রেমে পড়লেন নাতনির। পরিণতিতে নাতনির শরীরে মাতৃত্বের লক্ষণ। ঘটনা জানাজানি হতেই কীটনাশক বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন দাদু হাজি শামসুল হক।

এ ঘটনা সন্দীপের। বড় ছেলের মেয়েকে মন এবং আরও কিছু দিয়ে ফেলেছিলেন হাজী সাহেব। লোক জানাজানি হতেই পুলিশ গ্রেফতার করে তাকে। জামিনে ছাড়া পেয়ে আত্মহত্যা করেন। (দৈনিক বাংলা)

সরষের মধ্যে

গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হওয়ায় এক ভাই আত্মসমর্পণ করলেন, অন্যজনকে তো পুলিশ আগেই হাজতে বন্দী করেছিল। দু' ভাইকে আদালতে হাজির করলে অস্থায়ী ম্যাজিসট্রেট তাদের জামিনে মুক্তি দেন।

বিচারের দিন পড়লো যথারীতি। নথিপত্র দেখে বিচারক হতবাক!

গ্রেফতারী পরোয়ানাটাই যে জাল!

(দৈনিক ইত্তেফাক)

রুমা গুহঠাকুরতা

এক-একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক-একটি ব্যক্তিনাম আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে যায়, নিঃসন্দেহে এমনি নাম রুমা গুহঠাকুরতা এবং ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার। ১৯৫৮ সালের জন্মলগ্ন থেকে সন্তানপ্রতিম যত্নে তিনি একে লালন করে চলেছেন। সলিল চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত কয়্যারের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পরমুহূর্তে মঞ্চেই তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়ে দলের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকারা দলত্যাগ করেন। এর জবাব দিয়েছিলেন তিনি দু'সপ্তাহের মধ্যে খোলা মাঠে কয়্যারের অনুষ্ঠান করে। সেই শুরু, আর রুমা গুহঠাকুরতা কখনো পিছন ফেরেননি। গত ২২ বছরে তিনি দলত্যাগীদের বন্যার মতো ভাসিয়ে দিয়ে দেশ বিদেশে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। যে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানকে তিনি নিয়ে চলেছেন স্থিরলক্ষ্যে, তার ভিত গাঁথা হয়েছিল একেবারে ছেলেবেলাতেই।

জন্মেছেন কলকাতায় ২১ নভেমবর ১৯৩৪ সালে। মা সেকালের স্বনামধন্যা গায়িকা সতী দেবী। পিতা সত্যেন্দ্রনাথ (মণ্টি) ঘোষ ছিলেন সাংবাদিক। রবীন্দ্রনাথ তার নাম রেখেছিলেন কমলিকা। চার বছর বয়সে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় লরেটোর কনভেনটে। যুদ্ধের বোমার আতঙ্কে এবং পারিবারিক কারণে ১৯৪১ সালে মার সঙ্গে মাসিমার বাড়ি লাহোরে চলে যান। সেখানে মায়ের গান শেখানোর ক্লাসেই প্রথম গান শিক্ষা। লাহোরের কনভেনটে ভর্তি হন তিনি। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উদয়শঙ্করের আমন্ত্রণে মার সঙ্গে আলমোড়া চলে গেলেন।

লাহোর রেডিও থেকে সতী দেবীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে' গান শুনে উদয়শঙ্কর তার বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ জানান। সেই উপলক্ষে যাওয়া পরে সতী দেবী উদয়শঙ্কর কালচারাল সেনটার'-এর সংগীত শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে সেখানেই রয়ে গেলেন। আর শিশু রুমা হলেন সেখানকার ছাত্রী। মাত্র সাড়ে তিন বছর তিনি ছিলেন সেখানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার শিল্পী জীবনের ভিতটি গাঁথা হয়ে গিয়েছিল এখানেই। নাচ, গান, ছবি-আঁকা, ভারতের বিভিন্ন অধিবাসীর জীবনযাত্রা, পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা প্রস্তুত প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে কঠোর শিক্ষাদানের মধ্যে যে আত্মনির্ভরতা গড়ে উঠেছিল পরবর্তী জীবনে সেটিই ছিল প্রধান সম্পদ। সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রতিদিন হাঁটার ক্লাসে। এত ছন্দোবৈচিত্র্য হাঁটার মধ্যে তার দিকে দৃষ্টি পড়েছিল উদয়শঙ্করেরই কৃপায়। তার কথা রুমাদেবী বারবার সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন।

১৯৪৪ সালে সারা ভারত পরিক্রমা করে বোমবাইয়ে শেষ অনুষ্ঠান করার পর আপন দল ভেঙে দিলেন উদয়শঙ্কর। ওখানের নৃত্যানুষ্ঠানটি দেখে আকৃষ্ট হয়ে দেবিকা রানী সতী দেবীর অনুমতি নিয়ে বমবে টকীজ-এ শিশু-শিল্পী হিসাবে রুমা দেবীকে ভর্তি করলেন। তখনই মাসিক বেতন স্থির হল পাঁচশো টাকা। তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। প্রথম ছবি 'জোয়ার ভাঁটা'। এ ছবিতেই নিজের কম্পোজিশনে নেচেছিলেন। প্রধানত নৃত্যশিল্পীই ছিলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোটখাটো ভূমিকায়ও অভিনয় করতে হত। সে-সময়ে আরো দু'জন শিশুশিল্পী ছিলেন বমবে টকীজে—পরলোকগত নায়িকা মধুবালা এবং আজকের চরিত্রাভিনেতা শশীকলা।

বোমবাইয়ে মালাড স্টেশনের কাছে একটা মাটির বাড়িতে থাকতেন। বাড়ির সব কাজে মাকে সাহায্য করে সকাল দশটায় স্টুডিও যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। বোমবাইয়ে পরপর অনেকগুলি ছবিতে কাজ করলেন। ইতিমধ্যে সতী দেবী পৃথ্বী থিয়েটার্সে অভিনয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন। রুমা দেবী পড়াশুনোর জন্য চলচ্চিত্রের কাজ ছেড়ে বান্দ্রাতে 'মাউনট মেরীজ কনভেনটে' ভর্তি হলেন। একই সময়ে আই পি টি এ-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে রবিশঙ্করের 'ডিসকভারি অব ইনডিয়া'তে অংশ গ্রহণ



করেন, এই সূত্রে কিছু অর্থোপার্জনও হয়। সতী দেবীর উপর সাংসারিক চাপ বেড়ে যাওয়াতে নীতীন বসু রুমা দেবীকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'-অবলম্বনে বাংলা 'সমর' ও হিন্দি 'মশাল' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করাতে চাইলেন। সতী দেবী সানন্দে রাজি হলেন। বলা বাহুল্য, আর্থিক কারণেই। 'সমরের' কাজ শুরু হল। সহশিল্পী অশোককুমার-সুমিত্রাদেবীর মতো প্রখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে সমান দক্ষতায় তিনি অভিনয় করলেন। অন্ধ বালিকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নীতীনবাবু তাকে চেনা ও অচেনা নানা স্থানে অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের চলাফেরা লক্ষ করতে নির্দেশ দেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন বোমবাইয়ের বাসিন্দা।

পাশের ফ্লোরে 'মহল' ছবির কাজ চলছিল। কিশোরকুমার ওখানে আসতেন গানের জন্য। রুমা দেবী ইতিমধ্যেই 'জিদ্দি' ছবিতে তার গান শুনে গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। প্রথমে পরিচয়, পরিচয় ক্রমে ভালোবাসায় পরিণত হয়। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ১৬ ফেবরুয়ারি ১৯৫০। এ বিয়েতে কিশোরকুমারের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে তুমুল অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, যার ফলে বোমবে টকীজ-এর প্লে-ব্যাক সিংগারের বাঁধা মাইনের চাকরিটিও বিয়ের দু'দিন পরেই খোয়াতে হয়। কিন্তু কিশোরকুমার দমেননি, শচীনদেব বর্মণের সহায়তায় এবং নিজের অসাধারণ নিষ্ঠায় প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। রুমা দেবী ইতিমধ্যে চেতন আনন্দের 'অফসার' ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং তা 'সমর' ছবির আগেই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। 'সমর' মুক্তি পাবার পর তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেতাদের সঙ্গে ২১টি ছবিতে অভিনয় করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। একমাত্র কিশোরকুমারের নিজস্ব ছবি 'লুকোচুরি'তে গান করেন। জনপ্রিয় হয় কিশোরকুমারের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠের গান "মায়াবনবিহারিণী হরিণী" ; রেকর্ডের অপর দিকে



হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে "তোমার গীতি জাগাল স্মৃতি"। ১৯৫২-তে পুত্র অমিতের জন্ম।

ইতিমধ্যে কিশোরকুমারের জীবনে কাজ এবং অর্থের প্রাচুর্যে জীবনের উদ্দেশ্যও বদল হয়েছে। তাই মানসিকভাবে তার সঙ্গে সমতা রাখা সম্ভব হয়নি। রুমা দেবী নিজেকে ব্যাপৃত রাখার জন্য আবদুল রেহমান খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধে ক্ল্যাসিকাল গান শিখতে শুরু করলেন; যোগ দিলেন বোমবাইয়ের ইয়ুথ কয়্যারে। সলিল চৌধুরী তখন কয়্যার প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করছেন। ১৯৫৬-তে কয়্যারের প্রোগ্রাম করতে বোমবাই থেকে কলকাতায় আসেন। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় যাতায়াত শুরু হয়। সত্যাজিৎ রায় তখন 'অপরাজিত' ছবি তুলছেন। পারিবারিক সূত্রে তিনি তার আপন মেসোমশায়। সেই সূত্রে তার সহকারী অরূপ গুহঠাকুরতার সঙ্গে তার পরিচয়। পরিচয় ক্রমে গভীর হয়। পরে ১৯৬০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫৮-তে রাজেন তরফদার বোমবাই গিয়ে তাকে 'গঙ্গা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রস্তাব দেন। কোনো দ্বিধা না করে সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চলে আসেন ঐ বছরের আগস্ট মাস থেকে।

অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন তখন, যার মধ্যে তপন সিংহের 'ক্ষণিকের অতিথি' ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাত্রিক-পরিচালিত 'পলাতক'-এ অভিনয় করে পুরস্কারও পেয়েছেন। তপন সিংহের 'নির্জন সৈকতে' এবং সত্যাজিৎ রায়ের 'তিন কন্যা'র মণিহারা'র কাহিনী অংশে 'বাজে করুণ সুরে' গেয়েছেন। শ্রীরায়ের সংগীত পরিচালনায় 'বাকস বদলে' গেয়েছেন 'মায়ার খেলা'র নির্বাচিত অংশ।

সত্যাজিৎ রায়ের 'অভিযানে' অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছেন। সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন অরূপ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় 'বেনারসী' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করে। গ্রামাফোন রেকর্ডে বেশ কয়েকটি গান করেছেন সে সময়ে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভূপেন হাজারিকার সুরে আধুনিক বাংলা গান 'ওরা আজ করবে আঘাত' এবং বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত অরূপ গুহঠাকুরতার কাছে শিখে। এছাড়া লং প্লে নাটক 'চিরকুমার-সভা'য় অভিনয় ও গানে শ্রোতাদের অভিনন্দন লাভ করেছেন।

১৯৫৮-য় যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন সে সময়ে সলিল চৌধুরীর প্রেরণায় ইয়ুথ কয়্যার প্রতিষ্ঠা করলেন। কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠান ঐ বছরের ডিসেমবরে। বাইশ বছর ধরে ইয়ুথ কয়্যার আশাতীত সাফল্য লাভ করে। '৭২-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎসব উদযাপনে সরকারী প্রতিনিধি হয়েছিলেন; '৭৪-এ ইয়ুথ ফেসটিভাল-এ ডেনমার্ক এবং '৭৮-এ মসকো ডেনমার্ক লনডন প্রভৃতি জায়গায় দল নিয়ে গিয়েছেন। ১৯৬০ সাল থেকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে এ-গ্রেডের শিল্পীদল হিসাবে স্বীকৃত ছিল। কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে 'যুববাণী' উদবোধনের সময় থেকে যুক্ত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে চিফ প্রাডিউসার-এর পদের জন্য আবেদন করেন, তারপর থেকে টেলিফোনে অপরিচিত মহিলার কটুক্তি তাকে বিব্রত করে তোলে। যথারীতি দলবাজির গোলকধাঁধায় তিনি হারিয়ে যান। তারপর 'কোরাল ইউনিট' চালু করানোয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর অনুরোধে দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরি। অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন রুমা দেবী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথমত, বাঙালী দ্বিতীয়ত, সোজা কথা, সরকারি ব্যুরোক্রাটদের চক্রান্তে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। নীতি ও সম্মানের প্রশ্নে। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার বেতার ও দূরদর্শনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

এখন বছরের অধিকাংশ সময়েই ইয়ুথ কয়্যার নিয়ে কলকাতা এবং সারা ভারতে অনুষ্ঠান করতে হয়। অবসর সময় কাটে গান শুনে; ইয়ুথ কয়্যারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে। বড় ছেলে অমিতকুমার থাকেন অধিকাংশ সময় তার বাবা কিশোরকুমারের কাছে। কলকাতায় এলেই মার কাছে। অন্য দুই পুত্রকন্যা অয়ন এবং শ্রমণা এবং স্বামী অরূপ গুহঠাকুরতাকে নিয়ে তার সংসার। মা সতী দেবী আমৃত্যু তার কাছেই ছিলেন। তাদের দেখাশোনা সংসারের অন্যান্য টুকিটাকি রান্না ইত্যাদি করতে হয়। রান্না করতে ভালোবাসেন। আর ভালোবাসেন গান শুনতে, ফৈয়াজ খাঁর গান, কেশরবাঈয়ের গান, আর রবীন্দ্রনাথের গান জর্জদার (দেবব্রত বিশ্বাস) গলায়। জর্জদার ট্রেনিং-এ অজয় করের একটা ছবিতে 'যখন ভাঙল মিলন মেলা' গানও গেয়েছিলেন। স্বামী অরূপ গুহঠাকুরতার কাছে পূর্ণ সহযোগিতা পান তিনি, অরূপবাবুও স্বীকার করেন রুমা দেবীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ক্ষমতার। নিজে একক অনুষ্ঠানের জন্য রেডিও অডিশনে পাশ করতে পারেননি। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা, 'অডিশন দিচ্ছেন সে কথা আগেই কেন জানাননি, তাহলে ফলাফলের হেরফের ঘটতই'—কোনো শুভার্থীর একথা জানার পর বেতারে গান গাইবার ক্ষেত্রে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। লনডনের স্যাডেলস ওয়েলস থিয়েটার হল-এ মাইক ছাড়া একটি তানপুরার সঙ্গে যখন 'বাজে করুণ সুরে' এবং 'গঙ্গা' গানটি গেয়ে শোনান, ওখানকার অপেরা এবং ফিলহার্মোনিক অর্কেসট্রার পরিচালক কলিন ইয়ং অভিভূত হয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। এখন ইয়ুথ কয়্যারকে নিয়েই তার নানা পরিকল্পনা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীতের শিল্পীদের এখানে আনিয়ে তাদের অনুষ্ঠান করাবেন, সংগ্রহ করবেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত এবং সেইসব গান স্বরলিপি করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন। তবে সরকারি সাহায্য নৈব নৈব চ। ইয়ুথ কয়্যারের অনুষ্ঠানে তার কণ্ঠে 'গঙ্গা আমার মা', অথবা 'বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের' গান শুনে স্তব্ধ হয়ে যান না এমন শ্রোতা ক'জন আছেন? এখানেই তার সার্থকতা। তার কণ্ঠের গান আমাদের জীবনের গান হয়ে উঠে সার্থক হয়। ★

সাক্ষাৎকার : সুভাষ চৌধুরী



প্রিয়ব্রত

দুর্নীতির ঘায়ে দগদগ করছে অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি

◆ পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

...এক যে ছিল রাজা।

রাজার ছিল একটা ঘোড়া। নধরকান্তি এই শ্বেত অশ্বটির পিঠে চড়ে নগর পরিক্রমায় বের হতেন মহারাজ। বেশ চলছিল এমনি করে। ঘোড়ার জন্যে দৈনিক বরাদ্দ ছিল পাঁচ সের ছোলা। দেখা শোনা নাওয়ানো খাওয়ানোর জন্যে একজন সহিস। বেশ চলছিল তারও। ঘোড়ার খাবারে ভাগ বসিয়ে দিব্যি ছিল সে।

কিন্তু দিব্যি থাকা তার কপালে সইলো না।

ঘোড়ার পিঠে চাপতে গিয়ে রাজা মশাইয়ের খটকা লাগলো। ঘোড়াটাকে যেন একটু দুবলা লাগছে! আগে পিঠে চাপতে গেলে লাফাতো ঝাঁপাতো। এখন যেন ঠিক তেমনটি করছে না। তবে কি?

রাজামশাইয়ের সন্দ হল। বেটা সহিস নির্ঘাত ফাঁকি দিচ্ছে। ঠিক মত দেখভাল করছে না। যেমনি চিন্তা, তেমনি কাজ। সহিসের উপর খবরদারির জন্যে এলো নতুন ম্যানেজার।

তক্কে তক্কে থেকে ম্যানেজার সাহেব পাকড়াও করলেন সহিসকে। একা একা ঘুঘু ধান খেয়ে যাও।

নিরুপায় সহিস ম্যানেজারের সঙ্গে ভদ্দর-লোকের চুক্তি করল ঃ ঘোড়ার পাঁচ সের বরাদ্দ থেকে এতদিন আমি নিতাম এক সের। আপনিও নিন।

বরাদ্দের পাঁচ সের যেমন ছিল তেমনিই রইল। শুধু পেট বাড়লো একটি। ছিল দুই হ'ল তিন।...

কথা হচ্ছিল দক্ষিণবঙ্গের এক মিউনি-সিপ্যাল কনট্রাকটরের সঙ্গে। টেনডারের কালি শুকোবার আগেই তালি-পড়া রাস্তার হাড় জিরজিরে করুণ অবস্থা কেন হয় জানতে চেয়েছিলাম। তিনিই শোনালেন এই গল্প। বিষণ্ণ হেসে বললেন, আপনারা বলবেন শা...কনট্রাকটর পয়সা মেরেছে। আমাদের অবস্থা ওই সহিসের মত। যত দিন যাচ্ছে তত মুখ বাড়ছে। ছোট-বড় মেজো সেজো কত টেবিলের নীচ দিয়ে যে হাত বাড়াতে হয়! তাই ঘোড়ার পেটে আর দানা...

শুধু দক্ষিণে নয়। সুদূর উত্তরের প্রত্যন্ত প্রান্ত বালুরঘাট কিংবা কলকাতার পাশেই শ্রীরামপুরের পথ চলতি নাগরিক জীবনের সঙ্গে মফস্বল রানাঘাটের জীর্ণ পথে দুঃস্বপ্নের পরিক্রমায় কোন ফারাক নেই।...সেই মরা বেড়ালের ছানা, কাঁঠালের ভুতি, মাছের কানকো—ছাইপাঁশ আরো কত কিছু!

এক পশলা বৃষ্টির পর নর্দমার জল উপচে পড়ে সব একাকার! উত্তরবঙ্গের সীমান্ত শহর বালুরঘাটের ভুবলা রোডের এক হাঁটু জল ঠেলে 'অ' বাবু যখন মুণ্ডুপাত করেন পৌর প্রশাসনের তখন তার সঙ্গে রানাঘাটের জি এন পি সি রোডের পথ চলতি 'আ' বাবুর কথায় আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

দক্ষিণের বারুইপুর থেকে উত্তরের বালুর-ঘাট, হুগলীর শ্রীরামপুর থেকে নদীয়ার রানা-ঘাট প্রত্যেকটি পৌরসভাতেই আশ্চর্য এক অনীহা লক্ষ্য করেছি রাস্তাঘাট আর পয়ঃ-প্রণালীর সুষ্ঠু সংস্কারের প্রতি। আমাদের সমীক্ষার কাজে বেছে নেওয়া এই চারটি পুর শহরের একটিতেও সুস্থ নগর জীবনের প্রথম শর্ত রাস্তা ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। আদ্যিকালে বিছানো অ্যাসফল্টের উপর নিপুণ দর্জির মত রিফুশিল্প ছাড়া আর কিছু হয় এমন ধারণা করা সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয় না। আর এই রিফু? তাতেও...

ভাঙ্গা রাস্তায় হোঁচট খাওয়া কিংবা বৃষ্টির জলের খানাখন্দ ডোবার বাধা সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েও রেহাই নেই। আবর্জনার পাহাড়। জঞ্জালের স্তূপ দুর্গন্ধে নরক করে রেখেছে সর্বত্র। রানাঘাটে সুভাষ এভিনিউয়ের মুখে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ থেকে ছড়ানো পূতি-গন্ধ বাতাস ভারী করে ছড়িয়ে আছে শ্রীরাম-পুরের টিন বাজারে। অবস্থার ইতর বিশেষ নেই অন্যত্রও। পুরসভার ময়লাবাহী গাড়ি? তার দেখা মেলে অবরে সবরে। কোথাওবা তার উপস্থিতি মাসিক কিংবা ত্রৈমাসিকও হয়ে যায়! অভিযোগ? করবেন কার কাছে? কথায় বলে দেওয়ালেরও কান আছে কিন্তু পুরসভার কানগুলোই নাকি সব নিরেট শব্দসহ দেওয়ালে তৈরি। সুতরাং...

ঃ আবর্জনা পরিষ্কার হয় না? হয়। তারও আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র আছে। ধরুন রামবাবু খুব ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক কিংবা হাত চুলকুনি বন্ধের জন্যে মাঝে মাঝে টু-পাইস খরচা করার সুনাম আছে তার। এহেন ব্যক্তির বাড়ি যদি কোন অনুষ্ঠান হয় তাহলে দেখবেন বাবুদের তৎপরতা...

চশমার কাঁচ ধুতির খুঁটে মুছতে মুছতে রানাঘাটের সুভাষ এভিনিউয়ের মনোহারী দোকানের মালিক শৈলেনবাবু তার অভিজ্ঞ নিদান দিলেন। দোকানের ঠিক সামনেই কাঁচা ড্রেনের ধারে জমে আছে মরশুমী আনারসের সবুজ পাতার ডাঁই। অপরিসর রাস্তার দুপাশ জুড়ে চিঁড়ে মুড়ি থেকে কলা বাতাসা কাপড় চোপড় গামছার দোকান বসেছে। রাস্তার সিংহভাগই তাদের দখলে!

ঃ আর দুদিন বাদেই পাতা পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে। এভাবে কি ব্যবসা হয়?

শৈলেনবাবুর মন্তব্যকে অনেকখানি অতি-রঞ্জন বলে মনে হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু সে ভুল ভাঙল আর এক শহরে। আর এক পরিবেশে।

সেদিন ১০ জুন। পৌরসভার হাল-হকিকৎ দেখতে ঘুরছি শহর শ্রীরামপুরের রাস্তায়। টিন বাজারের নরক থেকে এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য রোডে পড়তেই অবাক কাণ্ড। একই রাস্তায় শ্রীরাম-পুর পৌরসভা নামাঙ্কিত দু দুটি লরি। শুধু কি তাই? দু'পাশে তৎপর ঝাড়ুদার!

কি ব্যাপার? এমন দুর্লভ দৃশ্য চর্মচক্ষে দেখা যায় শ্রীরামপুরে! সঙ্গী সাংবাদিক বন্ধুও হতবাক। রহস্য পরিষ্কার হল আরও কয়েক পা এগোতেই। আবর্জনাবাহী দ্বিতীয় লরিটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার ঠিক উল্টো দিকের বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা।

ঃ মিসত্রি সলভড!

ঃ কি?

ঃ ম্যারাপ। মানে কোনো বিষ্টুবাবুর বাড়িতে অনুষ্ঠান। সুতরাং...

আমার মনে পড়ল শৈলেনবাবুকে। দুর্নীতি আর স্বজনপোষণ ভুগোলের বেড়া ডিঙিয়ে যায় অক্লেশে। শ্রীরামপুরের দর্পণে প্রতিবিম্বিত রানাঘাট কিংবা বারুইপুরে মুখ

দেখে বালুরঘাট। আরও একটু সহজ করে বললে পশ্চিমবাংলার ১১২টি পৌরসভার হাঁড়ির হাল এইসব খানাখন্দ জলা ডোবার ফ্রেমে বন্দী হয়ে আছে।

: রাস্তার করুণ হাল তো নিশ্চয়ই দেখেছেন। সেই ১৯৬৯-এর চেয়ারম্যানের আমলে টি আর'এর টাকা দিয়ে যে রাস্তাঘাটের কাজ হয়েছিল তারপর আর বিশেষ কিছুই হয়নি। থরো রিপেয়ারিং দূরের কথা বিটুমেন ওয়ারক যেটুকু মাঝে মাঝে হয় তাও স্পেসিফিকেশন ছাড়াই। তাতে কাজ হয় না কিছুই; শুধু অপচয় হয় সরকারী অর্থের।

বালুরঘাট হাই স্কুলের টিচারস রুমে বসে কথা বলছিলেন শিক্ষক আশিস রায়। ওর মুখের কথা কেড়ে নিলেন রাধারমণ বাবু: ট্যাকস আদায় ছাড়া এই মিউনিসিপ্যালিটি নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে উন্নয়নমূলক কোন কাজ করেন বলে বালুরঘাটের মানুষ মনে করে না। শহরের ড্রেনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পাকা ড্রেন নেই, কাঁচা নিকাশী ব্যবস্থা বিহীন ড্রেন মশা আর রোগ জীবাণুর পীঠস্থান। দিনের পর দিন অবস্থা শুধু খারাপই হচ্ছে। জমা জল সরানোর জন্যে গ্যাংকুলি কিংবা ভাঙা বালব বদলানোর জন্যে হাঁটাহাঁটি করতে প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যানকে হতাশ হতে হয়েছে! ডিম্যানড রেজিসটারে অভিযোগ লিখিয়েও রাস্তার একটা বালব বদলাতে তার সময় লেগেছে দীর্ঘ পনেরো দিন। আমাদের কথা নাইবা শুনলেন।

: শহর উন্নয়নের জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির কোন মাথাব্যথা নেই এমন কথা সত্যি নয়। তবে আমাদের আর্থিক সঙ্গতি নেহাতই সীমিত। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না···

বালুরঘাটের ভারপ্রাপ্ত পৌরপ্রশাসক কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্যের কাছে নাগরিকদের হতাশার কথা, ক্ষোভের কথা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব সামাল দিয়ে পুর প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে তাকে তাই পৌরভবনে তার দেখা মিলেছিল বিকেল চারটের সময়।

···সরকারী সাহায্য ছাড়া এক পাও এগোতে পারি না। আর সরকারী সাহায্যের পুরো ব্যাপারটাই কনট্রিবিউটরি বেসিসে হয়ে থাকে। অথচ আমাদের তহবিলের অবস্থা যা তা থেকে কনট্রিবিউশনের কোন প্রশ্নই আসে না। মোট ব্যয়ের তুলনায় আয় মাত্র ৬০ শতাংশ! তবুও এরই মধ্যে ৩,৪০,০০০ টাকায় সাতটি রাস্তা ও তিনটি ড্রেনেজ স্কীমের কাজ শেষ পর্যায়ে, সারভিস ল্যাটরিনকে স্যানিটারি করার জন্যে প্রথম কিস্তিতে সরকারী সাহায্যের ৩৬,০০০ টাকায় ২৭টির কাজ সম্পূর্ণ। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এসবই অকিঞ্চিৎকর। এছাড়া টাউন হল তৈরির জন্যেও একলাখ টাকার একটা প্রকল্প সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

উঠে আসার আগে বললেন, অভিযোগ আছে, সমস্যা আছে, তাই নাগরিকদের ক্ষোভও সঙ্গত। কিন্তু আমাদের তরফে যে শুধুই ঔদাসীন্য বা আন্তরিকতার অভাব আছে এমন ভাবনা নেহাতই একপেশে। সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্যে আরও অর্থের জন্য দরবারও করছি।

রানাঘাটের পৌর প্রশাসক কমলেশ চ্যাটারজি দুঃখ করে বললেন: রাস্তাঘাটের যা অবস্থা—সারাবার ইচ্ছে আমাদেরও নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু কি করবো বলুন, আমাদের হাতে একটা রোলার পর্যন্ত নেই। পি ডবলিউ ডির রোলার ধার নিয়ে খাড়াবড়িথোড় করে ঠেকা দেওয়া। অথচ নিজেদের জন্যে একটা কেনার মত আর্থিক সামর্থ্য নেই।

শহরের উন্নয়নের জন্য পৌরসভার ভূমিকার প্রশ্নে শ্রীচ্যাটারজি জানালেন, ওয়াটার ওয়ারকসের কাজে ইতিমধ্যেই ৮২,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। প্রায় ষাট শতাংশ কাজও হয়ে গিয়েছে। প্রিভি এবং স্যানিটেশনের জন্যে বরাদ্দ ২৪,৫৯০ টাকা দিয়ে ৩৭টি সার্ভিস ল্যাট্রিন স্যানিটারি করা হয়েছে। আর—

—খুশির গলায় পৌর প্রশাসক জানালেন, এছাড়া ৫০,০০০ টাকার শিশু উদ্যানে, ৮৩,০০০ টাকার টাউন হলের কাজও শুরু হবে শিগ্‌গিরই, সেই সঙ্গে সুইমিং পুল! এর জন্যেও অনুমোদন মিলেছে ৩৫,০০০ টাকার।

সুইমিং পুল! কমলেশ বাবুর খুশখবরী বার্তায় খুশীর চেয়ে অবাক হলাম বেশি। রানাঘাট মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের শহর; যেখানে ডাঙায় হাঁটতেই মানুষকে চারবার ঠোক্কর, পাঁচবার হোঁচট খেতে হয় তাকে সাঁতার শেখানোর জন্যে কসটিউম পরিয়ে পুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা রাজসিক তামাসা ছাড়া আর কি! স্বাভাবিক কারণেই রানাঘাটের মানুষ বিরক্ত এবং বিক্ষুব্ধ।

বিক্ষোভ এবং হতাশা শ্রীরামপুরেও। আজ থেকে ১৪ বছর আগে পৌরসভার শতবার্ষিকী স্মরণিকায় ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি আর উন্নয়ন প্রকল্পের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার অনেকখানিই নিছক কল্পনাচারিতায় পর্যবসিত। 'স্নটার হাউস' আজও হয়নি, পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম? একদিকে গ্যালারীযুক্ত নিছক ঘেরা মাঠ। অপরিকল্পিত। স্মারক পুস্তিকায় আঁকা নকসার সঙ্গে যার অমিল লজ্জা দেয় মিলকে। বেমরশুমে এই মাঠ ভরে যায় শেয়ালকাঁটার জঙ্গলে।

: একসিকিউটিভ অফিসারের আমলে

অ্যাসেসমেনট কিভাবে হয়

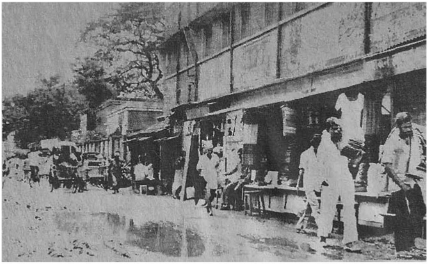
······ফর দি পারপাস অব প্রিপেয়ারিং দি ভ্যালুয়েশন লিসট অব হোলডিংস···ইউ আর হেয়ার বাই রিকোয়ারড টু ফারনিশ দি আনডারসাইনড··· এ ট্রু অ্যানড কারেকট রিটারন অব দি রেনট অর অ্যানুয়াল ভ্যালু অব ইয়োর হোলডিং······

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাকট ১৯৩২-এর ১৩৪ ধারা অনুযায়ী জারি করা এই বিশেষ নোটিশটির সঙ্গে পৌর এলাকার বাসিন্দাদের পরিচয় মোটামুটি গভীর। পাঁচ বছর অন্তর 'অ্যাসেসমেনট' নামক যজ্ঞের সঙ্গে জড়িত এই বিশেষ সূচনাপত্রটি এক রাশ ক্ষোভ, হতাশা, ক্রোধ প্রভৃতি নেতিবাচক রিপুগুলোকে উসকে দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে।

এই অ্যাসেসমেনট বা কর নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন-ই দিকগুলো এরকম: বি এম অ্যাকট ১৯৩২ এর ৭৬ (ক) ধারার শর্তাবলী পূরণের যোগ্যতাসম্পন্ন কর নির্ধারক নিযুক্ত হন পৌরসভার নির্দেশে। তিনি জারি করেন নোটিশ '······ফর দি পারপাস ইত্যাদি ইত্যাদি। কর নির্ধারণের জন্যে বাড়ির অবস্থান, অবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে ঘর পিছু কাল্পনিক ভাড়া ধার্য করা হয়। এইভাবেই সম্পূর্ণ বাড়ির মোট বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত মোট ভাড়ার ২৯.৫ শতাংশ ত্রৈমাসিক কর হিসেবে ধার্য হয়।

এছাড়া পঞ্চবার্ষিক কর-নির্ধারণের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এরকম: যদি এইভাবে বার্ষিক মোট ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব নয় বলে অ্যাসেসর মনে করেন তবে, বাড়ি/সম্পত্তির মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই মূল্য নির্ধারণ সময় জমির দাম, সম্পূর্ণ সম্পত্তির অবস্থা, উপকরণের দাম, বাণিজ্যিক সুবিধা, জল ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, রাস্তা-স্কুল-কলেজ-বাজার ইত্যাদি নাগরিক জীবন উপকরণের সহজ লভ্যতা, পরিবেশ সব কিছুই বিচার্য। এইভাবে যে মূল্য নির্ধারিত হবে তার ৭৫ শতাংশ ত্রৈমাসিক কর হিসেবে ধার্য করা হয়ে থাকে।

পঞ্চবার্ষিক কর নির্ধারণ ছাড়াও বছরের যে কোন সময়ে বার্ষিক কর নির্ধারণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী নির্ধারিত কর পরিমার্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিবর্ধন, নতুন ভাড়াটিয়া বসনো বা অন্য কোনভাবে ভ্যালুয়েশন বেড়েছে এমন কোন ঘটনা কর্তৃপক্ষের নজরে এলে তারা কর হারের পুনর্বিন্যাস করতে পারেন।



এখানে শুধু টাকাই উড়েছে। কাজ হয়নি কিছুই। বর্তমান বামফ্রন্ট আমলে পুরোনো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আবার দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় এম এল এ মার্কসবাদী নেতা ব্যস্ত মানুষ কমল ভট্টাচার্যই চেয়ারম্যান। কিন্তু···কথা শেষ না করেই সহজেই থামলেন পৌরসভার প্রবীণ কর্মীটি।

'কিন্তু'র রহস্য খুঁজতে গিয়ে মালুম হল সরকারি প্রশাসকের সঙ্গে নির্বাচিত প্রশাসকের পার্থক্য কিছুই নেই। দুজনেই ব্যস্ত মানুষ। একজন রাজনীতি নিয়ে, অন্যজন প্রশাসনিক ঝক্কি নিয়ে। প্রায় দুলাখ লোকের এই বিশাল শহরের হাজারো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ কোথায়!

অবকাশ যে নেই, নাগরিক সমস্যা আর অভাব অভিযোগ যে তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ সান্যালের কথাতেই তা পরিষ্কার। শহর শ্রীরামপুরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বললেন, পৌরসভার হাতে বর্তমানে তেমন কোন স্কীম সম্পর্কেও আমাদের ভাবনা এখনও চূড়ান্ত হয় নি।

নৈবেদ্যের মাথায় কাঁঠালী কলার মতো পৌরপ্রশাসনের চোখের সামনে তাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যাল ভূগর্ভস্থ সুয়েরেজ সিসটেম। ডাম্পিং বিভাগের পাঁচটির মধ্যে তিন তিনটি পামপই অচল।

অন্য দুটির একটি অর্ধসচল। ময়লা জল ফিলটার করার পাটও বহুদিন চুকে গিয়েছে। যন্ত্রপাতি সবই অকেজো। দেড়খানা চালু পামপ যে দুর্গন্ধময় আবর্জনা যুক্ত জল টেনে আনে ডাম্পিং হাউসে গত ১৫/১৬ বছর ধরে নেহরুনগর কলোনীর কাছে ছেড়ে দেওয়া সে জলে কলুষনাশিনী গঙ্গা নিত্য কলুষিত হচ্ছে পৌরসভার তত্ত্বাবধানে।

কর্তৃপক্ষের বিকারহীন নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সাধারণ মানুষের পথ চলার সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। উদাহরণ: রাজেন্দ্র বাগ রোড। রেল স্টেশনের সামনের এই ব্যস্ত সড়কের ওপর পশরা নিয়ে পথ আটকে অজস্র বে-আইনী হকার। পায়ে চলার পথ সংকুচিত হতে হতে সরু একটুকরো ফালিতে পরিণত। দু'দুটো সিনেমা হল, বাসস্ট্যানড, রিকশার বিশৃঙ্খল ভিড়, আবর্জনার স্তূপ ঠেলে এগোনো রীতিমত কসরতের ব্যাপার। আর এক পশলা বৃষ্টি হলে? এ রাস্তা নিখুঁত নরক। শ্রীরামপুর টকিজের সামনে রাজা রামমোহন সরণিতে তো দিব্যি বাজার বসে গিয়েছে পথের দুপাশে। সকালে আধঘণ্টা আগে যিনি এ বাজার থেকে মাছ কিনেছেন, অফিস যাবার সময় তিনিই ট্রেন ধরতে ছোটেন মাছওয়ালীকে গাল দিতে দিতে।

সরাসরি সি এম ডি এ এলাকাভুক্ত পৌর এলাকা শ্রীরামপুর। সেই সুবাদে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। মূলত মিউনিসিপ্যালিটির নির্ধারিত কর্তব্যের অনেকখানি দায়ই বহন করছে সি এম ডি এ। হতশ্রী খোলস বদলে ঝকঝকে হয়েছে নেতাজী সুভাষ এভিনিউ, কাজ চলছে ডেনিস খাল সংস্কারের। এই সংস্কার সম্পূর্ণ হলে কুমীর জলা, রামমোহন সরণী প্রভৃতি অঞ্চল গঙ্গার বানভাসি হবে না। তবে সি এম ডি এ প্রকল্পিত শ্রীরামপুর-এসপ্ল্যানেড রুটে বাস চলেনি, স্টেট ট্রানসপোর্ট করপোরেশন বাস স্ট্যানড তৈরির কাজও শেষ হয়নি কোন এক অজ্ঞাত কারণে। ১৯৭৯ এপ্রিল যে প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল আজও তা স্বপ্নই।

ঃ ভেবেছিলাম সি এম ডিএ-র এলাকার মধ্যে যখন পড়েছে তখন নিশ্চয়ই দক্ষিণের এই অবহেলিত মিউনিসিপ্যালিটির কাজে কর্মে উন্নয়নের আভাস মিলবে। কিচ্ছু হয়নি মশাই, কিচ্ছু না। স্রেফ ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। আগে টাকার অঙ্ক কম ছিল এখন সি এম ডি এর কল্যাণে তা দু'দশ লাখ বেড়েছে। আর আমরা···

বারুইপুরের বিশিষ্ট নাগরিক পঞ্চানন মুখারজি ফেটে পড়লেন ক্ষোভে। সাড়ে তিন বর্গমাইল এলাকার এই পৌরসভার কাজে অনেক বিক্ষোভ জমে আছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। জীর্ণ রাস্তা, কাঁচা ড্রেন আর অকেজো নলকূপ নাগরিক স্বাস্থ্যের প্রতি পৌরসভার চরম অনীহার কথাই বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে যখন পৌরসভা ভবনে ঢুকলাম তখন বিকেল চারটে ছুঁই ছুঁই। এক্সিকিউটিভ অফিসার তরুণ বি ডি ও বি কে সেন তখনও পৌঁছাননি। ঢুকতেই ট্যাকস কালেকটরদের ঘর। টেবিলে পা তুলে দেওয়ালে চেয়ার ঠেকিয়ে দিবানিদ্রামগ্ন ব্যক্তিটিকে জাগাতেই নিমিলিত নয়নে প্রথম মন্তব্য ঃ আজ হবে না।

কি হবে না জানতে না চেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই চোখে পড়লো পোসটার 'পিছন দরজা দিয়ে লোক ঢোকানো চলবে না'।

শ্রীঅরবিন্দের নামাঙ্কিত হালকা সবুজ ছিমছাম সাজানো ঘর। দেওয়াল জোড়া মনীষীদের ফটো (দুর্জনে বলে তুলসীকাঠের মালা!) বিশাল সেনটার টেবিলে বসেছিলেন বড়বাবু। টানা বেনচে দর্শনার্থীর ভিড়। শ্রীসেন এলেন চারটে পনেরোয়।

ঃ বারুইপুর পলিটিক্যালি অত্যন্ত সেনসিটিভ এরিয়া। পঞ্চায়েত ইলেকশনের পর কাজের চাপও বেড়েছে। প্র্যাকটিকালি মিউনিসিপ্যাল প্রবলেমস নিয়ে ভাববার বা দেবার মত সময়ই মেলে না! ব্যস্ত মানুষ শ্রীসেন তার অসুবিধের কথা বলছিলেন। নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার নিরসনে পৌরপ্রশাসনে ভূমিকা প্রসঙ্গে বললেন, কাঁচা ড্রেনের সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই ফুড ফর ওয়ারক স্কীমে ১০,৬৬৬ টাকা ও ১৬ কুইনটাল গম খরচ করা হয়েছে। এছাড়া সি এম ডি-এ ৪,১১,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন রাস্তা এবং ড্রেনের রিপেয়ারিং ওয়ারকের জন্যে। সে কাজও শুরু হল বলে।

—একশ বছর অতিক্রান্ত এই পৌরসভায় স্যানিটারি ইনসপেকটর নেই। রাস্তার কাজ কিংবা স্পেসিফিকেশন দেখার জন্যে ওভারসিয়ার পর্যন্ত নেই ঃ নেই কোন রেকরড বুক কিংবা ডিমানড রেজিসটার! প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীর সংখ্যাও কম······

ঃ কি ইলেকটেড বডি কি এক্সিকিউটিভ অফিসার কোন আমলেই আমাদের অবস্থার ইতর বিশেষ হয়নি। ও আমল তো দুর্নীতির রেকর্ড করেছিল, এ আমলের অকর্মণ্যতার ছোট একটা নজির দিই ঃ আমার এক বন্ধুর ভ্যাকানট ল্যানড বিক্রি করার পর ক্রেতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নাম পত্তন করতে গেলে শোনেন বাকি ট্যাক্সের পরিমাণ ১৩,০০০ টাকা। কিন্তু রসিদ সহ চেপে ধরতেই রহস্য পরিষ্কার ঃ কোন খাতা পত্র না দেখেই ট্যাকস জারি করা হয়েছিল! পরে হিসেব অনুযায়ী

তা ৯,০০০ টাকা হয়। সেই অনুযায়ী মে-র ৬ই সে চেক ইস্যু করা হয় কিন্তু জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত সে টাকা ক্যাশ হলেও খাতায় তোলা হয়নি কিংবা রসিদও দেওয়া হয়নি। ক্যাশ হওয়ার পর টাকাটা কোথায় যায় ?

পঞ্চাননবাবুর অভিযোগের সঙ্গে প্রাক্তন কমিশনার এবং বারুইপুর নাগরিক সমিতির অন্যতম নেতা মৃণালবাবুর বক্তব্যের মিল অনেকখানি। রাস্তা তৈরি, ড্রেন রিপেয়ারিং কিংবা যেকোন কনস্ট্রাকশনে কাজে টেনডার দেওয়ার ব্যাপারে কারচুপির ঘটনা আজও অব্যাহত। সর্বনিম্ন কোটেশন দিয়েও কনট্রাকট পাননি এমন নজিরও আছে বলে অভিযোগ ঃ সি এম ডি এ-র উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারে নজির হয়ে থাকবে বারুইপুর। শহরের রাস্তা এবং ড্রেনের আমূল সংস্কারের জন্যে যে ২৭ লাখ টাকা খরচ হয়েছে তা নিয়ে অভিযোগের পর অভিযোগ উঠেছে। সঙ্গত অভিযোগ। যে রাস্তা তৈরি হয়েছে তার মান অত্যন্ত নিচু—কোন ক্ষেত্রেই তার আয়ু দু'তিন মাসের বেশি নয়। ঘাসের উপর পিচ ঢেলেও পাকা রাস্তা বলে চালানো হয়েছে। আর ড্রেন ? তার হাল তো নিজেই দেখেছেন—খাপছাড়া ভাবে যা করা তার কোনটারই আউট-লেট নেই। বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রভবন আজও অসম্পূর্ণ। দফায় দফায় শুধু প্ল্যানই বদলিয়েছে, নীচুমানের ইঁটে ধরেছে নোনা—গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধের আর কত ফিরিস্তি দেবো ?

আর এইসব অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে কয়েক বছর আগের সি বি আই তদন্তে। তদন্ত করেছেন অ্যাসিস-ট্যানট কমিশনার, এমনকি তদানীন্তন জেলা শাসকও। হয়েছে সবই, যা হয়নি তা হল অপরাধীর শাস্তি—সব তদন্ত রিপোর্টই রহস্য-জনকভাবে ধামা চাপা পড়ে গিয়েছে।

দক্ষিণের শতবর্ষ অতিক্রান্ত পৌরসভার আনাচে কানাচে জমে থাকা মৃণালবাবুর এই ক্ষোভ, সুদূর উত্তরের অনাদৃত বালুরঘাটের সাংবাদিক রাধারমণবাবু কিংবা শিক্ষক আশিস রায়েরও মনের কথা। আমাদের সমীক্ষিত চারটি পৌরশহরের একমাত্র নির্বাচিত প্রতি-নিধি প্রশাসিত শ্রীরামপুরও এই দুর্নীতির ক্ষয়-রোগের শিকার। সেখানেও বাতাসে সুয়েরেজের মূল্যবান পারদ কিংবা পৌরসভার পুকুরের মাছ চুরির ঘ্রাণ।

অবস্থার ইতরবিশেষ নেই এখানেও। বাবুদের মনেও ইচ্ছে একটাই ঃ এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই ! এরা সব লুটে-পুটে খাচ্ছে আর আমাদের 'হুদা' বোঝাচ্ছে। বালুরঘাটের প্রবীণ সাংবাদিক এমনি কিছু অভিযোগের তাকথিত কাহিনী শোনালেন, মিউনিসিপ্যাল ভবন থেকে প্রশাসকের চেয়ার পর্যন্ত সরকারী অর্থের অপচয়ের নজির।

ঃ বর্তমান পৌরসভা ভবন তৈরির ব্যয় খুব বেশি হলে এক লাখ টাকা—একথা একজন অভিজ্ঞ এনজিনিয়রের। কিন্তু টু-পাইস আয়ের পথ সুগম করতে এর খরচ দেখানো হয়েছে আসলের তিনগুণেরও বেশি। সাড়ে তিন লাখ টাকা। আর আগের প্রশাসকের বাইশ হাজারী চেয়ার (সিংহাসন) তো ইতিমধ্যেই কিংবদন্তী। কাঁচ ঢাকা একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর চেয়ার কেনা হয়েছে ১৫,০০০ টাকায় আর বোম্বে থেকে আনতে খরচ লেগেছে মাত্র ৭,০০০ টাকা !

মিনি মারকেটের কথাই ধরুন। বাস স্ট্যানডের কাছে সাড়ে তিন লাখ টাকায় তৈরি এই মারকেট এখন ভবঘুরেদের আস্তানা আর অসামাজিক কাজের আড্ডা ! পরিকল্পনার অদূরদর্শিতা আর রাজনীতির প্যাঁচে একটা সুন্দর সম্ভাবনা অর্থ অপচয়ের চূড়ান্ত নজির হয়ে গেল।

—দুর্নীতি আর টাকা নয়ছয়ের ঘা তো এই মিউনিসিপ্যালিটির সর্বাঙ্গে ! ধাঙড়দের জেল কুঠুরীর মত কোয়ার্টারস তৈরির নামে জলাঞ্জলি দু'লাখ টাকা, আত্রেয়ীখালের বাঁধের জন্যে এক লাখ টাকা গিয়েছে প্রথম পর্বে। সে কাজ ঠেকাতে এখন আরও এক লাখ টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। খাদিমপুরের ড্রেনেজ স্কীমে শুধু পাবলিক মানির ড্রেনেজ হয়েছে। শুধুমাত্র সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে আউটলেট বিহীন এই ড্রেন উপকারের চেয়ে অপকারই করছে অনেক বেশি—এক পশলা বৃষ্টিতেই দুকূল ছাপিয়ে রাস্তা ভাসিয়ে একাকার !

জল সরবরাহের মত আবশ্যিক শর্ত পূরণের ক্ষেত্রেও পৌরসভাগুলি তাদের দায়িত্ব পালনে তৎপর এমন কথা মনে এলো না বারুইপুর এবং বালুরঘাটের জল ব্যবস্থার হাল দেখে। দুটি পৌরসভাতেই পানীয় জলের অন্যতম উৎস নলকূপ। তিরিশ হাজার অধিবাসীর শহর বারুইপুরে নলকূপ আছে মাত্র ৬০টি ; আর ২.৪৬ বর্গমাইল এলাকার বালুরঘাটে ২৮৬টি। এবং এর একটা বড় অংশই বহু ব্যবহারে অচল। সচল করার কোন তাগিদ কর্তৃপক্ষের নেই।

বালুরঘাটে ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে পূ দফরের জনস্বাস্থ্য প্রযুক্তি বিভাগ যে জলাধা তৈরি করেছেন তার দায়িত্ব পৌরকর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে নিতে রাজি নন বলে জানিয়েছেন পৌরপ্রশাসক কৃষ্ণগোপালবাবু। কারণ ৬,০০,০০০ টাকা ভরতুকি দেবার মত অবস্থা পৌরসভার নেই।

সাধারণ নাগরিকদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন স্বাদের। চালু না হতেই ট্যাঙ্কে ছেঁদা, শহরের একাংশ জুড়ে পাতা পাইপ লাইন অকেজো। মাঝে মাঝে পরীক্ষামূলক জল ছাড়ার গুঁতোয় রাস্তা-ঘাট সব জলে জলময়। এ অবস্থা আর কতদিন তা দেবা ন জানন্তি !

একই হাল বারুইপুরেও। জনস্বাস্থ্য প্রযুক্তি বিভাগ মোট পাঁচ লাখ লিটারেরও

কেমন করে বাড়ির ট্যাকস স্থির হয় ?

'আপনার একতলা বাড়ি দোতলা হয়েছে ? কিংবা নিদেন পক্ষে এক-আধটা বাড়তি ঘর ? হলেই আমরা জানতে পারি। কারণ ট্যাকস আদায়ের ফতোয়া নিয়ে বছরে বার চারেক আমাদের তো যেতেই হয়। তাই নজর এড়ায় না কিছুই ! আর বাড়ির বাড়বৃদ্ধি মানেই তো আমাদেরও দুটো পয়সার মুখ দেখা।'

এমনি এক সংলাপের মাধ্যমেই পরিচয় হয়েছিল শতবর্ষের পৌর-প্রশাসিত শহরের এক ট্যাকস কালেকটরের সঙ্গে। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। চোখে পুরনো ফ্রেমের চশমা। সব কথার সঙ্গে 'যা বলি সাফ কথা বলি' মাত্রা থাকে।

চায়ের পেয়ালার চুমুক দিয়ে একতলা আর তিন তলার একই অংকের ট্যাকস রহস্য ভাঙছিলেন, 'পাঁচসালা অ্যাসেসমেনটই বলুন আর ইনটারিম অ্যাসেসমেনটই বলুন, সবই আমাদের রিপোরটের ভিত্তিতেই হয় ! অ্যাসেসর যিনি আসেন তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকার চুক্তিতে তিনিও টু-পাইস পকেট ভর্তি করে নিয়ে যান। আর নেবেন নাই বা কেন ? এই ধরুন, আমাদের মিউনিসিপ্যাল এলাকার কথা। মোট হোলডিং এগারো হাজারের বেশি অথচ যিনি অ্যাসেসর আসবেন এই এগারো হাজার হোলডিং অ্যাসেসমেনটের জন্যে কাগজ কলমে পাঁচ হাজারের বেশি পাবেন না ! এই মজুরিতে কুলি কামিনও মিলবে না। অগত্যা—

তাই রতনবাবুদের পোয়াবারো। গৃহস্থের কানের কাছে এসে মৃদু সুরে দরদস্তুর। অবশ্য বখরার ব্যাপারটা শিকল পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত !

বাড়ি এক থেকে তিনতলা হয়েছে ? গন্ধে গন্ধে রতনবাবুরা হাজির। এ ঘর ও ঘর ঘুরে হিসেব করে জানিয়ে দেবেন 'আপনার ট্যাকস সামনের কোয়ার্টার থেকে শ দেড়েক টাকায় দাঁড়াবে। আপত্তি করলে পাঁচ/দশ টাকা কমবে—'

অবৈজ্ঞানিক ট্যাকস পদ্ধতি আর ভ্যালুয়েশনের হ্যাপা সামলাতে বাঁহাতের চুলকানি থামান। তাহলেই বছরের পর বছর··· ॥



বালুরঘাট

কিছু বেশি জল ধরে রাখতে পারে এমন দুটি জলাধার তৈরি করেছেন, পাইপ লাইন বসেছে শতকরা পঁচিশভাগ। কিন্তু গলদ বেঁধেছে বিসমিল্লায়—দু'দুটো জলাধারই ইতিমধ্যেই সছিদ্র হয়ে জল বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করে ফেলেছে! তৃতীয় রিপু জলকেও রেয়াত করে না। মনে পড়ল সেই সাহিসের গল্প……..

এসবই হল পুকুর চুরির গল্প। জন-সাধারণের অর্থের অপচয় হলেও এক ধরনের ঔদাসীন্য দেখা যায় সাধারণ নাগরিকদের ব্যবহারে। না জিগ্যেস করলে মুখ খোলেন না কেউ। ভাবটা যেন 'আদার ব্যাপারী…'। পুকুর চুরির কথায় রা না কাড়লেও সিঁদেল চুরির ব্যাপারটাতে সবাই সোচ্চার, সকলে সরব পৌরসভার বিরুদ্ধে—ট্যাক্স আদায়ের নিয়ম কিংবা অনিয়মের সিঁদ কাঠি সরাসরি হালকা করে তাদের পকেটের ভার পঞ্চবার্ষিক অ্যাসসমেনট কিংবা বার্ষিক কর পুনর্বিন্যাস দুটি ক্ষেত্রেই অবিচারের ক্ষোভ তাদের বুকের গভীরে জমা হয়ে আছে।

শহরের হাল ফেরাবার ব্যবস্থা নেই, অবস্থার পরিবর্তন নেই, কোন নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন, অথচ ট্যাক্স বাড়ানোর ঘাটতি নেই—এ অভিযোগ উত্তর থেকে দক্ষিণ সবখানেই।

অ্যাসেসমেনটের পুরোটাই ধোঁয়াটে, নিত্য যন্ত্রণার বোঝার উপর এই শাকের আঁটি কখন যে কত গুণ হয়ে জর্জরিত করবে সেও এক রহস্যে। এই রহস্যের সঙ্গে সন্দেহের দানা তখনই মিলেমিশে জমাট বাঁধে, যখন দেখা যায় ছাপোষা কেরানীর ঘাড়ে তিনগুণ কর চাপলেও রেহাই পান ব্যবসাপট্টির মাড়বার নন্দনেরা। ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে বালুরঘাটে। '১৯৭৮ অ্যাসেসমেনটে আমার বাড়ির ট্যাক্স হয়েছে তিনগুণ কিন্তু ট্যাক্স বাড়েনি বাজারের জম-জমাট কারবারীদের!' এ অভিযোগ প্রভাবতী দেবীর। ১৯৭৮-এর 'অন্যায় অ্যাসেসমেনট বিরোধী' সর্বদলীয় নাগরিক সমিতির প্রকাশ্য সভায় বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ শ্রীশ চন্দ্র দাস এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সরকারী অ্যাসসরের বিরুদ্ধে তার গুরুতর অভিযোগ—সরাসরি উৎকোচ প্রস্তাব দেওয়ার!

বে-আইনী কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে পৌর-সভার বাসিন্দারা কখনও যৌথভাবে, কখনো বা এককভাবেও আদালতের আশ্রয় নিয়েছে—স্থগিতাদেশ এনে বাড়তি 'কর' দেওয়া থেকে বিরত হওয়ার পন্থা খুঁজেছে। বারুইপুরে তো সেই ১৯৭৪এর পড়েথাকা অ্যাসসমেনটের শুনানী আজও চলছে—চল্তে চলতেই ১৯৭৯-এর নতুন বোঝা, নতুন কর ধার্যের সময় সমাগত!

শুধু ট্যাকস বৃদ্ধিই নয়, ট্যাকস আদায়ের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা নামক বোধটি অনুপস্থিত পুরোপুরিই। ফলে কর বাবদ ধার্য টাকার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পৌরসভার হাতে আসে। অনেক ক্ষেত্রেই কোন এক ভৌতিক কারণে কর অনাদায়ী থেকে যায় বছরের পর বছর। বালুরঘাট কিংবা রানাঘাট অথবা বারুইপুর যেখানেই গিয়েছি ট্যাকস কালেকটরদের উপস্থিতির অভিযোগই শুনেছি বেশি। পাত্তা নেই মাসের পর মাস। 'উইদাউট প্রেজুডিস' রবার স্ট্যামপ অংকিত ফতোয়া, হঠাৎই জানিয়ে দিয়ে যায় 'আপনার ট্যাকস চার কোয়ার্টার বাকি—শোধ করুন অবিলম্বে, অসঙ্গতি? তদ্রুপ? তাও আছে। ঘুরে দেখেছি বারুইপুর, শ্রীরামপুর, বালুরঘাট, রানাঘাট—চারটি পৌরসভার হাওয়া বাতাসে অনেক কানাকানি। টাকা আত্মসাতের অভিযোগে রানাঘাট, শ্রীরামপুর আর বারুইপুরে হাল আমলে বরখাস্ত হয়েছেন তিনজন ট্যাকস-কালেকটর।

পৌরসভাগুলি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল নগর জীবনের শরিকদের কাছে স্থানীয়ভাবে স্বায়ত্বশাসনের স্বাদ পৌঁছে দেওয়া। সেবার আদর্শ নিয়ে নগর জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সংযোজন। সে স্বাদ এখন শুধু বিস্বাদই নয়, তিক্ত। সেই আদর্শ নির্বাসিত। রাজনীতির ঘোলা জলের তোড়ে বানভাসি হয়ে গিয়েছে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি। দিনের পর দিন জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। সাত সকালে বাজারের নরকের অভিজ্ঞতায় ফারাক নেই রানাঘাট আর বালুরঘাটে। সেই গুঁতোগুঁতি, সেই হুড়োহুড়ি, সেই থিকথিকে গা ঘিনঘিন কাদা! আর পথ চলা? সেও সেই পথের হাড়ের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হওয়া। কিন্তু কেন এমন হয়? নাগরিক সুখ সুবিধের দিনই বা কেন কষ্টকল্পনায় পর্যবসিত?

এই সব প্রশ্নের একটিই জবাব দেন পৌর কর্তৃপক্ষ: টাকা নেই। আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা সেই আর্থিক সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যম নেই। তাই এই চার পৌরসভার কোনটিতেই কর আদায়ের পরিমাণ চল্লিশ শতাংশের বেশি নয়। বিচিত্র অবস্থা বালুরঘাটে। টাকা থাকতেও নেই রব। মঞ্জুরীকৃত অর্থের বড় অংশই পরবর্তী বছরের ওপেনিং বাজেটের অংককেই স্ফীত করে মাত্র। কাজ ব্যাহত হয় স্রেফ উদ্যোগের অভাবে।

বারুইপুরের বড়বাবু জানালেন, আমাদের কালেকশনের টাকায় স্টাফ পেমেনট হয়। অন্যান্য খরচ কিংবা উন্নয়নের কাজ হয় সরকারী অনুদান থেকে। বছরে কত টাকা অনুদান মেলে? তার জবাব মিলল না। কারণ রেজিসটারই নেই যে! অথচ বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাকট ১৯৩২-এর ৯৩ ধারায় এই হিসেব রাখা নির্ধারিত! সে বোধহয় কাগজে কলমেই।

রানাঘাটের সুপার বাজার? সেও এক সুপার ফ্লপ। এ অভিজ্ঞতা বেকার তরুণ উত্তম কুণ্ডু, সঞ্জীব দেবনাথদের। বেকারী ঘোচাবার আশায় ৫০০-১০০০ টাকা দান হিসেবে দিয়ে ওরা ঘর নিয়েছিল। গত পুজোয় রমরমিয়ে শুরুও হয়েছিল—কিন্তু বে-আইনী হকারদের ধাক্কায় ওরা আবার রাস্তায়, সুপার বাজার ওদের কাছে নেহাতই কাঞ্চন মূল্যে কেনা রসিকতা।

এইসব হাজারো সমস্যা, হতাশা, বিরক্তির প্রেক্ষাপটে রাজ্য বিধানসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা সংশোধনী বিল' পেশ করা হচ্ছে। কলকাতা পৌর প্রশাসক ধ্রুব নারায়ণ ব্যানার্জিকে চেয়ারম্যান করে কর হার পুনর্বিন্যাস করার জন্যে 'সেনট্রাল ভ্যালুয়েশন বোরড' তৈরি হয়েছে, পৌরসভার আয় বাড়ানোর উপায় উদ্ভাবনে ডঃ ভবতোষ দত্তের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের কমিশনও বসেছে। কিন্তু উত্তেজনা নেই সাধারণ নাগরিকদের মনে। পৌরসভার ব্যাপার-স্যাপারে তারা অনেক-খানিই 'দুঃখেষু বিগতস্পৃহ…'। লক্ষণ শুভ নয়, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বায়ত্বশাসনকে আভিধানিক গণ্ডী মুক্ত করে পৌর জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে আস্থার বাতাবরণ সৃষ্টি করা এই মুহূর্তের জরুরী কৃত্য। তা না হলে এইসব কমিটি-কমিশন-বোরডের প্রতি তিক্ত ঔদাসীন্য থাকবেই।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের দেহ ইতিমধ্যেই পচনে আক্রান্ত—উপচে পড়া ডাসটবিনের ময়লার পাহাড় সেই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে বাতাসকে ভারি করে তুলছে! এই বিল কি সেই বাতাসে সজীব টাটকা সুস্থতার ঘ্রাণ ছড়াতে পারবে? ✦

ডাঃ মীরা ব্যানারজি

সুপার, আর জি কর

আউটডোরের এক রোগী অভিযোগ করছেন, অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েও ওষুধ পাচ্ছি না। কলেজ হাসপাতালের ছাত্ররা জানাতে এসেছেন, ক্লাসে স্যার যাননি। অফিসের কেরানী ফাইলের পাহাড় এনে বললেন, এখনি সই করে না দিলে টাকা আটকে যাবে।

উত্তর কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে গেলে আরও চোখে পড়ে, রোগীকে সান্ত্বনা দিয়ে, ছাত্রদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কেরানীকে আশ্বস্ত করে সবদিক সামলে দিচ্ছেন এক হাসিমুখ।

ঐ হাসিমুখ ডাঃ মীরা ব্যানারজির। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেনট। আগে রাজ্যের আর কোনো মহিলাই এই গুরুত্বপূর্ণ পদ পাননি।

মীরাদেবীর বয়স এখন বাহান্ন। সে আমলে কি করে ডাকতার হলেন? 'মামার বাড়ির প্রায় সকলেই ডাকতার। ঠাকুরমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি ডাকতার হই। নিজের গলায় স্টেথসকোপ ঝোলাবো ভাবতে ভালো লাগতো।'

টাঙ্গাইলে জন্ম। বাবার ছিল বদলির চাকরি। সেজন্য ইসকুলের বোরডিং-এ থাকতে হয়েছে অল্প বয়স থেকেই। মীরাদেবী প্রথম কলকাতায় আসেন পনেরো বছর বয়সে। বোমার ভয়ে ফিরতে হয় ঢাকায়। মেডিকেল ইসকুলে ভর্তি। ওখান থেকে সারটিফিকেট নিয়ে ফের কলকাতার ক্যামবেল হাসপাতাল থেকে এল এম এফ পাশ করেন। পরে আর জি কর হাসপাতালে এম বি বি এস।

হাউস স্টাফ হিসাবে যোগ দেন মধ্য কলকাতার ডাফরিন হাসপাতালে। পাবলিক সারভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওখানে স্থায়ী চাকরি। এ্যাডিশন্যাল আর এম ও। টানা সাত বছর।

ব্রিটেন পাড়ি দেন এরপরই। পরিবার পরিকল্পনার ট্রেনিং। ফিরে এসে সরকারি চাকরি। এর পিছনে অবশ্য ঘটনা। ১৯৬৫ সাল। পাক-ভারত যুদ্ধ। সীমান্ত এলাকার বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে কোনো মহিলা ডাকতারই টিকতে পারছেন না। পূরবী মুখারজি তখন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

মহিলা মন্ত্রীর অনুরোধ মহিলা ডাকতার ফেলতে পারলেন না। কেন সকলে চলে আসছেন তা জানার কৌতূহলও ছিল। হাসপাতাল বেশ লাগলো। যুদ্ধের সময়। দিনরাত কাজ। সবদিন নাওয়া-খাওয়ার ফুরসৎ মিলত না। সাধারণ রোগীরা ছাড়াও আহত জওয়ানদের চিকিৎসা। ছেলে কচি।



তাকে সঙ্গে নিয়েই মীরা দেবী হাসপাতালে যেতেন। রাতবেরাতে জরুরী কল এলেও ছেলে কোলে থাকতো।

বনগাঁ থেকে বারাকপুর। পরে কামারহাটি। সাবডিভিশনাল মেডিকেল অফিসার হিসাবে আবার বারাকপুর। ১৯৭৮ জুনে তিনি বীরভূমে চীফ মেডিকেল অফিসার। গত এপ্রিলে আর জি কর হাসপাতালের সুপারিনটেনডেনট। এই তিনটি পদেই তিনি প্রথম মহিলা। বাড়ির কেউ আপত্তি করেননি। 'তবে চেনাজানা অনেকের ধারণা ছিল, বিয়ের পর সংসারের চাপে ডাকতারি ছেড়ে দেবো।'

সোদপুরের শান্ত পরিবেশে সুন্দর বাড়িতে ডাঃ ব্যানারজি থাকেন। প্রতিদিন ঘুম ভাঙে

ঘরও করি, চাকরিও কার

ভোর চারটায়। পাঁচটায় স্বামীর বেড টি। ছেলের খাবার তৈরি করেন। সকালে ইসকুল। সে যা যা ভালোবাসে পরিপাটি করে রান্না করে দেন।

মীরা দেবী বহু রকম রান্না জানেন। ছেলে চাইনীজ ভালোবাসে। তাও করেন। নিজের শখ বাজার করা। ছুটির দিন হলেই পা বাড়ান বাজারে। সপরিবারে আত্মীয় বাড়িও যান। সিনেমা থিয়েটারও এক সঙ্গে। গান বাজনা শোনেন স্বামী ও ছেলের সঙ্গে।

স্বামীও ডাকতার। এলাকার চারপাশের মানুষ একডাকে ডাঃ সুধীর ব্যানারজিকে চেনেন। দু'জনের মধ্যে আগেই পরিচয় ছিল। বিয়ে সামাজিক। এক পেশায় দু'জনেই নামী, ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দেয়নি? 'সংঘাত? এ নিয়ে ভাবিনি তো!' আসলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুর্লভ সমঝোতা পারস্পরিক সম্পর্ককে করেছে ভারি মধুর।

মীরাদেবীর মুখেই শুনুন: 'স্বামী-স্ত্রীর পেশা এক হলে জীবন যাত্রায় বেসুর হবার কথা নয়। সমস্যা কি হয় না? হয় বই কি। আমরা নিজেরা মিটিয়ে নিই। সত্যি বলতে কি, এ্যাকমোডেটিভ স্বামী না হলে কোনো স্ত্রীই চলতে পারে না।'

'মেয়েরা অধ্যাপনা, চিকিৎসা, সাংবাদিকতা, নারসিং, কেরানীর চাকরি নিয়েও ঘর সংসার করতে পারে। তবে আইনজীবীর পেশা না নেওয়াই বোধহয় ভালো।' ডাঃ ব্যানারজির তাই ধারণা।

তিনি স্বীকার করেন, 'সংসার আর চাকরি দুই পর্বে মেয়েদের ওপর বড়ো স্ট্রেন পড়ে। বাড়ির কাজ মেয়েরা স্বাভাবিক কারণে ছাড়তে পারে না। ফলে দুটোই চালাতে গিয়ে শরীরের ওপর চাপ পড়ে।'

মহিলা হয়েও কর্মক্ষেত্রে ডাঃ ব্যানারজি রেহাই পাননি। বারাকপুরে থাকাকালীন তাকে ঘেরাও হতে হয়। সাত ঘণ্টার বেশি আটক ছিলেন। সে সময় তার মনে হচ্ছিল, ওরা কত অবুঝ, কত অবিবেচক। ওদের চিকিৎসা দরকার। পরেও তাকে ঘেরাও হতে হয়েছে। তিনি দমে যাননি। অন্যত্র বদলির তদ্বিরও করেননি।

কর্মক্ষেত্রে নানা বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন মীরা দেবী। সার্থকভাবে সবই মোকাবিলা করেছেন। কোন যাদুতে? 'আমি বিশ্বাস করি, কারো কথা ধৈর্য ধরে শুনে ভালোভাবে তার জবাব দিলেই আশি ভাগ কাজ মিটে যায়। সহানুভূতি ম্যাজিকের মতো কাজ করে।'

যুদ্ধ, বন্যার পরিবেশে অবিচল ডাঃ ব্যানারজি মাঝে মধ্যে বিচলিত হয়ে পড়েন, যখন নানা ধরনের চাপ সুস্থভাবে কাজ করতে দেয় না। মহাকরণে এর খবর সবসময় পৌঁছায় না। তার অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক চাপমুক্ত পরিস্থিতি থাকলে জটিল সমস্যা মিটাতেও বেগ পেতে হয় না।

সীমান্ত অঞ্চল, শিল্প এলাকা, মফস্বল শহর এবং মহানগরী—সব ধরনের পরিবেশেই মীরা দেবী কাজ করেছেন। কোথায় তিনি আনন্দ পেয়েছেন? 'অন্যত্র কাজে সুখ পেলেও কলকাতায় মাঝেমধ্যে ক্ষোভ জন্মায়। এখানে কাজের অবকাশ কম, ইচ্ছা থাকলেও সবসময় কাজ করা যায় না।'

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেনট ডাঃ ব্যানারজি। হাজার হাজার রোগী, ছাত্র, কর্মী তার নিয়ন্ত্রণে।

ডাঃ ব্যানারজি কিন্তু আর এক জায়গায় সুপারিনটেনডেনট। সোদপুরের সেই লাল বাড়ির। ওখানে তার নিয়ন্ত্রণে মাত্র দু'জন—স্বামী আর পুত্র।

ঘরোয়া সাম্রাজ্যেই তিনি অধিকতর সুখী সম্রাজ্ঞী। ★

সাক্ষাৎকার: বিশ্বজিৎ সিংহ

লৌহ কপাটের আড়ালে বসে যারা ছবি আঁকা শিখেছেন

রমেন দাস

মেয়ে জয়শ্রীর বয়স এখন বারো। ক্লাস এইটের ছাত্রী। পড়ে মধ্য কলকাতার একটি নামজাদা স্কুলে। মাঝেমধ্যে মেয়ে এবং স্ত্রী দেখতে আসে পরমানন্দ শর্মাকে। পরমানন্দ এখন আলিপুর সেনট্রাল জেলের বাসিন্দা। বয়স কমবেশি বাহান্ন। বছর খানেক আগে গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ডাকাতির অভিযোগে। সঙ্গে আরও দুজন পুলিশকে। গ্রেফতারের পর আদালতে চালান। তারপর জবানবন্দী, বিচার এবং অবশেষে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড। পরমানন্দ সেই থেকে কয়েদখানায়।

শৈশবে রাজস্থান থেকে আসা পরমানন্দ কলকাতার বাঙালী পরিবেশের মধ্যে মানুষ। ভাল বাংলা বলতে পারেন না। তবু নিজেকে এখন বাঙালী বলেই পরিচয় দেন। কলকাতার ছাপাখানা, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রকমারি পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও একটা নেশা তাকে প্রায়ই পাগল করত। শৈশব এবং কৈশোরে তিনি বিভিন্ন শিল্পীর ছবি আঁকা দেখতেন, আর অবাক হয়ে তার আশেপাশে ঘুরঘুর করতেন। ক্রমে অঙ্কন শিল্পের প্রতি তার কেমন একটা টান এসে যায়। সেই থেকেই বাড়িতে রঙ তুলি, আর পেনসিল নিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করতেন। কখনো আরট স্কুলে, অথবা কোন শিল্পীর কাছে ছবি আঁকা শেখার সুযোগ হয়নি। নিজে নিজেই, বাড়িতে বসে ছবি আঁকতেন। আর সেই সব ছবি ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন।

কিন্তু আলিপুরের কয়েদখানা এসে তার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটল। তারই বয়ানে বলা চলে : জেলে এসে নিঃসঙ্গ-নির্জন জীবন শুরু হল। দুশ্চিন্তা আর নানা ধরনের দুর্ভাবনায় অবশ-আলসো দিন কাটত। কয়েক দিনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠলাম। অসহ্য মনে হল কারাবাস। কিন্তু তারই মধ্যে জানতে পারলাম, কয়েদখানায় একটি আরট স্কুল আছে। সেখানে ছবি আঁকা, মডেল তৈরি ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা আছে। খবরটা পেয়ে একটু চাঙ্গা হলাম। অবশেষে সুযোগ পেয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আরট স্কুলের সামনে। একদিন, দুদিন, তিনদিন। দেখলাম, আমার মত অভিশপ্তরাই ঐ স্কুলে ছবি আঁকে, মডেল তৈরি করে। কারা-কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়ে ওখানে কাজ শেখার অনুমতি নিলাম। তারপর কবে, কিভাবে আমি এমন সুন্দর ছবি আঁকতে শিখলাম—নিজেও তা টের পাইনি।



কমরেড লেনিন/শিল্পী পরমানন্দ শর্মা

কী ধরনের ছবি পরমানন্দের বেশি প্রিয়? পোর্ট্রেট আঁকাতেই তার বেশি ভাল লাগে। সলজ্জভাবে এবং সবিনয়ে জানান : মাতা মেরী, ভগবান রামকৃষ্ণ, বালক ব্রহ্মচারী, এবং কমরেড লেনিনের পোর্ট্রেট এঁকে তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান।

পরমানন্দ কয়েদখানায় বসেই এখন রীতিমত একজন পেশাদার শিল্পী। একটি পোর্ট্রেট এঁকে গড়পড়তা পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা পান। কয়েকমাস আগে জেলখানারই এক সিপাই তার মৃত পিতার একটি ছোট ছবি নিয়ে তার কাছে হাজির। অনুরোধ, তা দেখে বড় একটি এঁকে দিতে হবে। পরমানন্দ অনুরোধ পেয়ে ভারী খুশি। অর্থ নয়—পরমার্থ লাভের আশায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে হাত দিলেন। তারপর সিপাই এসে যেদিন তার মৃত পিতার ছবিখানি দেখলেন আনন্দ আর উত্তেজনায় মুগ্ধ হয়ে কয়েদী শিল্পী পরমানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা আর আনন্দ—প্রতি-মুহূর্তে পরমানন্দের শিল্পী সত্তাকে উৎসাহ আর উদ্দীপনা জোগায়।

কারা-কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মেলা-প্রদর্শনীতে কয়েদী শিল্পীদের আঁকা ছবি মডেল বিক্রির ব্যবস্থা আছে। পরমানন্দের একাধিক পোর্ট্রেট তার মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হয়েছে। পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর টাকা হারে তা বিক্রিও হয়েছে। পরমানন্দের নামে সেই টাকা কারাগারেই জমা আছে। রঙ-তুলি-ক্যানভাস পেনসিল কিনতে তিনি এই মজুত তহবিল থেকে অর্থব্যয় করেন। প্রয়োজনে তা থেকে বাড়ির লোকদেরও অর্থসাহায্য করতে পারেন। কত টাকা ঐভাবে তার নামে জমা আছে জানতে চাইলে, পরমানন্দ বলেন অঙ্কের হিসাবে তার কোন হিসেব হয় না। বরং বলতে পারি, তার মূল্য আমার জীবনে অপরিসীম।

মেয়ে জয়শ্রী, অথবা স্ত্রীর পোর্ট্রেট আঁকার কথা মনে হয়নি?

: রঙ তুলি নিয়ে বহুবার ক্যানভাসের সামনে বসেছি। যখনই ওদের ছবি আঁকতে যাই, কেমন যেন দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। বুঝতে পারিনে, যাদের এত কাছে থেকে

জেলে জেলে শিল্প নিকেতন

পশ্চিমবাংলার সবকটি বড় জেলখানায় 'কলানিকেতন' স্থাপন করা হচ্ছে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট কারা-কর্তৃপক্ষকে জরুরী নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলখানায় আটক যেসব তরুণ-যুবক রয়েছে, মুহূর্তের উত্তেজনা অথবা ভুলের জন্য তারা হয়তো অভাবিত শাস্তি ভোগ করছে। অথচ অধিকাংশের মনেই রয়েছে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা এবং সারস্বত সাধনার সুপ্ত বাসনা। এইসব তরুণ-যুবক কয়েদীদের কারাবাসের অবসর জীবনে ঘটছে মূল্যবান সময়ের অপচয়। একটু চেষ্টা করলেই, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়ে তাদের জীবনের ধ্যান-ধারণার মোড় সহজেই ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব। আলিপুর সেনট্রাল জেলের 'কলানিকেতন' কয়েদী জীবনের সেই সম্ভাব্য দিকটার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও রেখেছে। অতএব সরকার সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার পর বিভিন্ন জেলখানায় 'কলানিকেতন' প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।

আলিপুর সেনট্রাল জেলের 'কলানিকেতন' গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশের দশকে। তদানীন্তন ডিসিপ্লিন অফিসার ডি সোম তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঐ নিকেতন প্রতিষ্ঠা করে বন্দীজীবনে সারস্বত সাধনার দুয়ার খুলে দেন। তারপর থেকে এ পর্যন্ত খুনী-ডাকাত, রাজনৈতিক বন্দীসহ অজস্র তরুণ-যুবক নীরব শিল্প সাধনার শেষে নিজেদের দক্ষ শিল্পীরূপে পরিণত করেছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার জেলখানার জন্য 'আর্ট ইনসট্রাকটার' পদ সৃষ্টি করে ভাবী শিল্পীদের নানাভাবে শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন।

দেখেছি, যারা আমার মনের মণিকোঠায় সব সময় জেগে থাকে, তাদের ছবি আঁকতে বসে আমি কেন এমন অবোধ হয়ে পড়ি।

পরমানন্দের দুঃখ, কারা-জীবনের আগে তার শিল্প অনুভূতি এমনভাবে তাকে নাড়া দেয়নি। দিলে হয়তো তার জীবনের গতি অন্য খাতে বইত। পরমানন্দের কথা : তবুও চেষ্টা করছি, যাতে অতীত জীবনের অন্ধকার অধ্যায় পার হয়ে নতুন আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে পারি। জয়শ্রী বড় হবে, সেই আশাতেই আমি বুক বেঁধে আছি। মহাপুরুষের সেই শাশ্বত বাণী—পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়—জয়শ্রী এলে আমি তাকেও শোনাই। কিশোরী মেয়ে জয়া তা শোনে, আর চোখের জলে আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জানি না, কবে এবং কীভাবে আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে পারব, তোর বাবা এখন আর কারাবাসী কয়েদী নয়, একজন শিল্পী!...

॥ ২ ॥

হুগলী জেলার গোপীনগর। কৃষিপ্রধান গ্রাম। চাষবাস করে গাঁয়ের মানুষ বেশ আনন্দে দিন কাটায়। শান্ত এই গ্রামও একদিন অশান্ত হয়ে উঠল। চমকে উঠলেন গ্রামের মানুষেরা। দেখলেন, চাষের জমি রক্তে রক্তে লাল। তারপর যা হয়। আতঙ্ক, আশঙ্কা পুলিশ পেয়াদা সবই একসঙ্গে। গ্রামের সব মানুষ জড়ো হলেন। উত্তেজনা-কান্না, হইচই। কিন্তু খুনের নায়ক রতন মাকাল তখনও নিখোঁজ।

১৯৬৭ সালের এই উত্তেজনার ঘটনার কথা গোপীনগরের মানুষ এখন প্রায় ভুলে গেছে। কিন্তু ভুলতে পারেননি রতন মাকাল। তখন তার বয়স ছিল ত্রিশের কোটায়। জমির দখল নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ। মাথায় খুন চাপল রতনের। নিহত হলেন রতনের প্রতিবেশী।

দশবছর আগেকার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে রতনের মুখ চোখে বিষাদের ছায়া। বললেন, যা হয়ে গেছে, তা নিছক দুর্ভাগ্য-জনক ঘটনা। বুঝতেও পারিনি, সামান্য আঘাতে প্রতিবেশী বন্ধুর মৃত্যু ঘটবে। বিচারের পর জেল। জেলে এসে কয়েকবার ঐ মর্মান্তিক ঘটনার স্বপ্নও দেখেছি। নিদ্রাহীন রাতের অকথ্য যন্ত্রণাও অনেকক্ষণ ভোগ করেছি। কিন্তু এখন ক্রমে তা লোপ পাচ্ছে। নিজের ত্রুটি বুঝতে পারছি। ক্লান্ত শ্রান্ত মন এখন চায় শান্তি। তাই একদিনের চাষীর হাতে এখন রঙ-তুলি আর ক্যানভাস।

রতন মাকাল ইতিমধ্যে দশ বছর কারা-জীবন কাটিয়েছেন। বয়স এখন চল্লিশের কোটায়, কথাবার্তায় এখনও গ্রামের ছাপ। সাদামাটা। কোনও চালিয়াতি অথবা আত্ম-প্রচারের মোহ নেই। স্বল্পবাক রতনের কাছে এখন ছবিই সব। তার বিষয়বস্তু দ্বিমুখী। পল্লী জীবনকে ভুলে যেতে পারেননি রতন, অথবা ভুলে থাকা যায় না। অতএব, তার তুলির টানে গ্রামের ছবি সচরাচর ফুটে উঠে। খেজুর গাছে ঝুলন্ত রসের হাঁড়ি, লাঙল কাঁধে চাষী, চালতে গাছের ডালে দোয়েল-ফিঙে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের যেসব ছবি তার তুলিতে ফুটে ওঠে—তার বিষয়বস্তু মূলতঃ ধর্মীয় এবং পৌরাণিক। রাবণের সীতাহরণ, সীতার বনবাস, শিবপার্বতীর সান্নিধ্যময় প্রেমালিঙ্গন, রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমদৃশ্য, যীশু, মেরীমাতা, রামকৃষ্ণদেব, কৃষ্ণের লীলা কাহিনী ইত্যাদি।



বুদ্ধ-সুজাতা/শিল্পী:রতন মাকাল

রতনের বৃদ্ধা মা এখনও বেঁচে। চার ভাই দেশে চাষবাস করে। মা-ভাইরা মাঝে মধ্যে আসে।মার একখানা ছবি আঁকার জন্য তার বড় সাধ হয়। কিন্তু মার কোন ফটো নেই বলে সে ছবি আঁকতে পারছেন না তিনি। তার ইচ্ছা,মার ছবি এ'কে সবসময় তা নিজের কাছে রাখবেন। ভাইদের বলেছেন, মার একটি ফটো পাঠাতে।

শিল্পী রতনকে প্রশ্ন করলাম, যাকে খুন করেছিলেন, তার কথা মনে পড়ে কি?

রতন সেই মর্মান্তিক কাহিনীর আর পুনরুল্লেখ করতে চান না। শুধু বললেন : সমবয়সী প্রতিবেশী বন্ধুর জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু দুঃখ করলেই তো তাকে আর ফিরে পাব না। উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষ জীবনে কি বিরাট ভুল করতে পারে, এবং তার পরিণতি কতখানি ভয়াবহ হতে পারে তা এখন বুঝতে পারছি।

রতন মাকালের আঁকা বহু ছবি বিভিন্ন প্রদর্শনী ও মেলায় বিক্রি হয়েছে। তার আঁকা পল্লী-প্রকৃতির ছবির বেশ চাহিদাও আছে। তিনি সেই ছবি বিক্রির টাকা থেকে রঙ তুলি ক্যানভাস কেনেন। কিছু টাকা বৃদ্ধা মার জন্য পাঠাবেন বলেও স্থির করেছেন। কারাজীবনে বসে তার যুগপৎ শিল্প-সাধনা এবং ঈশ্বর সাধনা দুইই চলছে, কারান্তরালে বসেও মনের প্রশান্তি লাভের এক অন্যতম উদাহরণ রতন মাকাল। কারা-কর্তৃপক্ষ মনে করেন, রতন সত্যসত্যই রত্ন। চলায় বলায়, আচরণে তিনি অনন্য। তার শিল্পীসত্তা ও ভগবত ভাবনাই হয়তো তার এই পরিবর্তনের চাবি-কাঠি।

আলিপুর সেনট্রাল জেলে খুন রাহাজানি চুরি ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত নানাধরনের দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীই আছে। আগে অবশ্য রাজনৈতিক বন্দীও অনেক ছিলেন। কারা-বাসী এই সব বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট কাজ আছে। সে কাজ তাদের নিয়মমাফিকভাবে যথারীতি করতেই হয়। কিন্তু ঐ কাজের পরও তাদের হাতে থাকে অফুরন্ত সময়। সেই অবসর সময় যাতে উদ্যোগী এবং উৎসাহী বন্দীরা অপচয় না করেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই জেলের তদানীন্তন এক অফিসার দেবব্রত সোম কারাভ্যন্তরে একটি 'কলাভবন' গড়ে তোলেন। সরকারী অফিসার হলেও সোম ব্যক্তিজীবনে ছিলেন একজন দক্ষ শিল্পী। কারাগারের সেই 'কলাভবন' এখন বহু কয়েদী শিল্পীর স্বপ্নিল আশ্রয়।

প্রয়াত শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ১৯৭৪ সালের ১৭ মারচ কয়েদী শিল্পীদের এই কলাভবনে তাদের শিল্পকলা দেখতে

আসেন। মুগ্ধ শিল্পী তা দেখে যে মন্তব্য করেছিলেন, এখনও তা কারাগারের সরকারী নথিতে জ্বলজ্বল করছে। তিনি লিখেছিলেন ঃ Quality of standard did not betray the objective of displaying of works.

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুতো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, কয়েদী শিল্পীদের হাতের তুলি এতটা সজীব ও ও প্রাণবন্ত হতে পারে। কয়েদীদের হাতের কাজ দেখে তিনি লিখেছিলেন ঃ···ছবিগুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এই পরিবেশের মধ্যে এসব শেখার অপূর্ব বন্দোবস্ত। যে শিখছে বা শিখবে সে পাবে আত্মসম্মান।···

সত্যসত্যই বহু কয়েদী শিল্পী আত্ম-সম্মান পেয়েছেন। তাদেরই অন্যতম শিবেন দত্ত। জেলে আসার আগে সে ছিল কলকাতার এক কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্র। একটি কিশোরী মেয়েকে তার ভাল লাগত। কিশোরীও তাকে ভালবাসত। ভালবাসা যেখানে গাঢ় মান অভিমানও, বোধ করি, সেখানে গভীর। মান-অভিমানের যখন পাল্লা চলছে, আচমকা তরুণ শিবেন একদিন কিশোরীর গালে এক চড় মেরে বসল। ঘটনাস্থল কিশোরীটির বাসভবন। কিন্তু এক অঘটন হয়তো তার জন্য অপেক্ষা করছিল। শিবেনের ভাষায় বলা যায় ঃ সামান্য একটু আঘাত যে অসামান্য হয়ে ওর জীবন কেড়ে নেবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি। তারপর যা হবার তাই হল। গ্রেফতার, আদালত, এবং বিচার। আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলাম আমি।

বিজ্ঞানের ছাত্র শিবেন ১৯৬৯ সালে কারাজীবন শুরু করেন। তারপর কলাভবনে চলে তার শিল্প-সাধনা। কবিতা লেখা, গান গাওয়া, হাস্যকৌতুক, ছবি আঁকা সব কিছুতেই শিবেন এগিয়ে। শিবেন তার কর্মকুশলতা, জনপ্রিয়তা ও আচার আচরণে সকলের মন কেড়ে নেন। কারাগার সমূহের ইনসপেকটর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নির্মলেন্দু ঘোষ বলেন, শিবেন তার সাধনায় সফল। এই তরুণ শিল্পীর আচরণও মনোমুগ্ধকর। তারই সুপারিশে শিবেন পরবর্তী সময়ে আগাম কারামুক্তি পান। শুধু তাই নয়, সরকার তাকে অন্যভাবেও পুরস্কৃত করেছেন। শিবেন দত্ত এখন আলিপুর সেনট্রাল জেলের কলাভবনের ইনসট্রাকটার, অর্থাৎ বেতনভুক সরকারী অফিসার।

আলিপুর সেনট্রাল জেলের সুপারিন-টেনডেনট কে এস মস্তান শিবেন প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত। তার মতে, শিবেন কারাশিল্পীদের উৎসাহের প্রতীক। মনে পড়ে, আলিপুর জেলে প্রধান বিপ্লবী অনন্ত সিং-এর সঙ্গে একবার পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। তিনিও তখন শিবেন তথা কয়েদী শিল্পীদের প্রশংসা করেছিলেন। বহু রাজনৈতিক বন্দীও যে কলাভবনে শিল্প সাধনায় মগ্ন থেকেছেন, অনন্তবাবু সে কথা বলেছিলেন।

শুধুমাত্র শিবেন কেন, এবাদুল্ল ইসলাম, নীলরতন মালাকার, মন্টু কোলে, কিঙ্কর


বন্ধা/শিল্পী: শিবেন দত্ত

ভূইঞা, নূর হোসেন-সহ অনেক কয়েদী শিল্পীই এক একজন দক্ষ শিল্পীরূপে এখন প্রতিষ্ঠিত। এখনও ছবি আঁকার পাশাপাশি কাগজের মণ্ড অথবা প্লাসটার অব প্যারিস দিয়ে নিয়মিত মডেল-মূর্তি তৈরির কাজ চলে কলাভবনে! কয়েদীশিল্পীরা ছবি আঁকেন, গান গা'ন, কবিতা আবৃত্তি করেন—একসঙ্গে সকলে তখন কলাভবনে জড়ো হন। কিন্তু দিনের শেষে যখন আবার কারান্তরালে নিঃসঙ্গ জীবনের মুহূর্তগুলি মুখর হয়, তখন বিক্ষিপ্ত চিন্তা আর কৃতকর্মের নানা ভাবনা তাদের নিঃসঙ্গ জীবনকে গ্রাস করতে চায়। মডেল-ছবি-ল্যানডস্কেপ অথবা পোট্রেটে ভরা স্টুডিও ছেড়ে যখন ভরা চার দেওয়ালের ছোট্ট খুপড়ির মধ্যে রাত্রির প্রহর গোনে, তখন আর যেন যন্ত্রণার শেষ হয় না। রতন মাকালের সহজ সরল স্বীকারোক্তি ঃ অজানা পাখির কর্কশ স্বর, অথবা প্রহরীদের বুটের শব্দে মধ্যরাত্রে যখন ঘুম ভাঙে, তখন যন্ত্রণার মুহূর্তগুলি আরও সরব হয়। মা-ভাইবোন, স্ত্রী-কন্যার করুণ মুখরেখা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। তখন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারি না।···

কারাগারের কলাভবনের দেওয়ালে টাঙানো রাধাকৃষ্ণের এক বিরাট তৈলচিত্র আর ভগবান যীশুর ছবি। তারই নিচে ইজেলের সামনে বসে রঙ তুলি হাতে কয়েদী শিল্পী পরমানন্দ শর্মা অনু স্বরে সুরে বললেন ঃ আমরা অতীতকে ভুলে যেতে চাই। অন্ধকারের বিভীষিকা অসহ্য। আমরা ভালোবাসার কাঙাল। সকলকে ভালবাসতে চাই। ভাল-বাসার জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনও পথ বাতলে দিতে পারেন কি?

ওর আরও কিছু বোধহয় বলার ছিল। বলতে পারলেন না। রুদ্ধবাক পরমানন্দের দু'চোখে তখন জলের ধারা। ★

আলোকচিত্র ঃ রাজীব বসু

নারী-কারাগার

একটি নারী-কারা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের কারাগার বা জেলখানা এদেশে দুর্লভ। প্রস্তাবিত এই কারাগারে কেবলমাত্র নারী কয়েদীদেরই রাখা হবে। আর তার তদারকিতে থাকবেন মূলত মহিলা অফিসার এবং কর্মীরা।

বর্তমানে এ রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে যেসব মহিলা কয়েদী আছে, তার সংখ্যাও নগণ্য নয়। কলকাতার তিনটি বড় কারাগার, আলিপুর সেনট্রাল জেল, প্রেসিডেনসি জেল এবং দমদম সেনট্রাল জেল। কিন্তু তার মধ্যে একমাত্র প্রেসিডেনসি জেলেই নারী কয়েদীদের রাখার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। সেখানে কিছু সংখ্যক মহিলা-কর্মী এবং কারারক্ষীও আছেন। এছাড়া জেলা পর্যায়ের কয়েকটি জেলেও মহিলা কয়েদীদের রাখবার ব্যবস্থা আছে।

রাজ্যের আই জি (কারা বিভাগ) ব্রিগেডিয়ার নির্মলেন্দু ঘোষ জানিয়েছেন, সরকারী ভাবে প্রস্তাবিত নারী কারাগারের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। বৃটিশ প্রশাসনের গোড়ার একটি তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, তদানীন্তন আমলে কানপুরের একটি কারাগারে এক মহিলা কয়েদীর দুরবস্থা দেখে জনৈক ইংরাজ অফিসার ক্ষুব্ধ হন। সেই মহিলাকে নাকি জেলখানার একটি কক্ষে আব্রুবিহীন অবস্থায় রাখা হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা তাকে পুরুষ কারা-কর্মীদের চোখের উপর রাখা হতো। নারী-কয়েদীর অসুবিধা-অসহায় অবস্থা সেই ইংরাজ অফিসারকেও সেদিন লজ্জা দেয়। তারপর তার উদ্যোগে একটি 'কারা কমিশন' তৈরি হয় এবং নারী-কয়েদীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত হয়।

ঐ প্রসঙ্গের রেশ টেনে ব্রিগেডিয়ার ঘোষ জানান ঃ স্বাধীন দেশে নারী-কয়েদীদের রক্ষণা-বেক্ষণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই তারা নারী-কারা তৈরির কাজে সম্প্রতি হাত দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন।

'স্বাধীন' সংবাদপত্র, 'বস্তুনিষ্ঠ' সাংবাদিকতা

সুদীপ মজুমদার

নতুন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীবসন্ত শাঠে শপথ গ্রহণের কয়েক ঘণ্টা পর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ঃ সংবাদপত্রগুলি যাতে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং করে তার দিকে তার মন্ত্রণালয় বিশেষ নজর দেবে। আপাত দৃষ্টিতে অতি নিরীহ মন্তব্য; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এতে বিপদের গন্ধ উঁকি মারে।

গত বছর দশেক ধরে সংবাদপত্রে 'সরকারী হস্তক্ষেপ' নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। সব সরকারই বলেছে—তারা 'বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সংবাদপত্র' চায়; কিন্তু কার্যত সংবাদপত্রের উপর নানা ধরনের চাপ এসেছে। শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার পর সংবাদপত্র জগতে 'কী হয় কী হয়' ভাবটা ফিরে এসেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশাঠের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রীশাঠে আশ্বাস দিয়েছেন, সংবাদপত্রের উপর সেনসরশিপ আর চাপানো হবে না; তবে সংবাদপত্রগুলিকে 'বস্তুনিষ্ঠ' হতে হবে। ওর মতে সাংবাদিকদের নিজেদের 'দোষী' মনে করার কোন হেতু নেই। একথা উঠল কেন? শ্রীশাঠে হয়ত বলতে চেয়েছেন—নির্বাচনের আগে প্রচার মাধ্যমগুলি ইন্দিরা কংগ্রেসের বিজয় বুঝতে চেয়েছিল; তাই নির্বাচনের ফল দেখে তাদের নিজেদের হয়ত দোষী মনে হতে পারে।

মজার কথা হল ঃ জনতা পারটি ক্ষমতায় আসার কয়েক মাস পরেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইও প্রেস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুরু করেছিলেন। কারণ সংবাদপত্র নাকি তাদের অন্তর্কলহের খবর ফলাও করে ছাপছিল। জনতা দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পরও একদল সব দোষ প্রেসের ঘাড়েই চাপালেন: ক্ষমতায় এসে চরণ সিংও একই পথ অনুসরণ করলেন। ওর অনুচর রাজনারায়ণ তো সংবাদপত্রের উপর ক্ষেপেই উঠেছিলেন। দলের ছেলেদের ডেকে বলেছিলেন '— কাগজ দেখলেই পুড়িয়ে ফেলো।' হরিয়ানার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তাতে সায় দিয়ে যেসব কাগজ সমালোচনা করবে তাদের 'দেখে নেওয়ার' হুমকীও দিয়েছিলেন। আর জরুরী অবস্থায় কিছু নির্ভীক সাংবাদিকের হাল তো সবারই জানা।

কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা কি বস্তু? সেটা শেখাবেন কে? তথ্য ও বেতার দফতরের আমলারা? সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে যাদের হাতে-কলমে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তারাই কি তাহলে এখন থেকে বলে দেবেন কি করে রিপোর্ট লিখতে হয়? এইসব প্রশ্নে দিল্লির সাংবাদিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি একদল সাংবাদিক যথারীতি মন্ত্রীমশাইয়ের পাশে ঘুরঘুর করাও শুরু করেছেন। ক্লীব সাংবাদিকও দেশে নেহাৎ কম নেই।

ভারতের সংবাদপত্রের কি ভূমিকা, এর মালিকদের সঙ্গে সরকারের কি সম্পর্ক, প্রেস কতটা ক্ষমতাশালী—ইত্যাদি প্রশ্ন নতুন করে বিবেচনা করার দাবি উঠেছে। এইসব প্রশ্ন বিবেচনার জন্য ১৯৫২ সালে প্রেস কমিশন গঠিত হয়। কমিশন সাংবাদিকদের বেতন ও ভাতা বাড়ানোর সুপারিশ করা ছাড়াও আরও কিছু উন্নয়নমূলক উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত সেগুলির কিছুই পালন করা হয়নি।

এদিকে গত কয়েক বছরে সংবাদপত্রের সংখ্যা বেড়েছে।, সারকুলেশনও বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার প্রচারের অনুপাতে কাগজ পড়ার হার বাড়েনি। সরকারী সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯৭৬ সালে ১৩ ৩২০টি নানান ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হত সারা দেশে। এর মধ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে ত্রৈমাসিক পর্যন্ত গোনা হয়েছে।

১৯৬৫ সালে সারা দেশে ৫২৫টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ১৯৭৫-এ দাঁড়ায় ৮৩৫টিতে এবং ১৯৭৬-এ ৮৭৫টিতে।

১৯৬৫ সালে সব পত্রপত্রিকার মিলিত সারকুলেশান ছিল ২,১৬ ৭৬ ০০০। ১৯৭৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,৪০,৭৫,০০০-এ।

কিন্তু এত সব হওয়া সত্ত্বেও খবরের কাগজ পুরো জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্র অংশের হাতে গিয়ে পৌঁছোয়।

মাঝে মাঝেই রব উঠেছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে কি? এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে মালিকের স্বাধীনতা এবং মালিকের প্রিয় সম্পাদকের স্বাধীনতা। অনেকেই বলবেন, ইদানীং কাগজ পড়তে আর তেমন ভাল লাগেনা। কারণ একঘেয়ে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা, আজ এক কথা কাল অন্য কথা। কাগজে যা বেরোয় তা সব সত্যি মনে হয় না।

আসলে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে ব্যভিচার ও অনাচার রয়েছে তারই প্রতিফলন হচ্ছে সংবাদপত্র জগতে। নানারকম সরকারী ও বেসরকারী উপহার পেয়ে অনেক সাংবাদিকেরা মান-মর্যাদা ভুলে অত্যাচারীরও সেবা করে চলেন কলম দিয়ে। কম পয়সায় বাড়ি, বিনা খরচে বিমানে যাতায়াত, মাঝে মাঝে বিদেশী দূতাবাসের স্কচ হুইস্কী ইত্যাদি মিলিয়ে বেশ সুখের জীবন। বিশেষতঃ রাজধানীর এক ধরনের সাংবাদিকদের। এরা, এদের মালিক আর সরকারী নেতাদের স্বার্থে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না।

তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যখন সংবাদপত্র জগতের এই অবস্থা তখন বসন্ত শাঠের মন্তব্যে সাংবাদিকদের চিন্তিত হবার কি আছে? এক নতুন ধরনের সাংবাদিকরা, যারা আজকাল কাজ করছেন বড় কাগজ ও ছোট ম্যাগাজিনেও, তারা মনে করেন একদল নপুংসক আর স্বার্থপর সাংবাদিকদের ব্যবহারের ভিত্তিতে গোটা পেশাটাকেই আক্রমণ করা যেতে পারে না। প্রেস জগতে অনেক ত্রুটি আছে কিন্তু সে ত্রুটি সারানোর কাজ তো সাংবাদিকদেরই করতে হবে। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে—মনে করেন অনেক তরুণ সাংবাদিক।

প্রেস সম্বন্ধে যে ভুল ধারণাগুলো জন্মেছে তার মধ্যে এর ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা অন্যতম। মনে হয় সংবাদপত্রগুলি যেন ইতিহাস তৈরি করতে পারে। আসলে তা নয়। শুধুমাত্র কিছু অন্যায় ও অবিচার লোকের সামনে তুলে ধরতে পারে মাঝেমাঝে। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে কিনা এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে।

সংবাদপত্র, রেডিও টি ভির কি ভূমিকা এই নিয়ে ইউনাইটেড নেশনসের এক কমিটি (ম্যাকব্রাইড কমিশন) বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা করে আসছে। কমিশনের রিপোরট তৈরিও হয়ে এসেছে। বোধহয় মার্চ মাসে প্রকাশিতও হবে। জানা গেছে কমিশন সবচাইতে বড় প্রশ্নটিকে এখনও সমাধান করতে পারেনি। প্রেস কি সরকারের অনুগত হয়ে কাজ করবে না জনসাধারণের স্বার্থের রক্ষক হিসাবে কাজ করবে—এই প্রশ্নের জবাব কমিশন এখনও দিতে পারেনি।

ভারত মনে করে স্বাধীন প্রেস সরকারী কাজকর্মের উপর কড়া দৃষ্টি রাখবে এবং সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। এতো হল সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা অন্যরকম। নানান প্রতিক্রিয়া দ্বারা সব সরকারই চেষ্টা করছে প্রেসের মুখ বন্ধ রাখতে এবং তাতে সফলও হয়েছে। যেদেশে মন্ত্রী, এম পি বেচাকেনা হয় সেদেশে সাংবাদিক তো কিছুই না।

দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের রিপোরটও বেরোবে তাড়াতাড়ি। অনেকেই আশা করেছেন—কি করে সংবাদপত্রগুলোর উপর থেকে বড় বড় শিল্পপতিদের প্রভাব দূর করা যায়, কি করে সরকারী হস্তক্ষেপ কম করা যায় আর কি করে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সাংবাদিকতা গড়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে কমিশন নিশ্চয়ই দিক নির্দেশ করবে। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা হল এক নতুন জাতের সাংবাদিক তৈরি হতে হবে যারা সরকারী অনুকম্পার অপেক্ষা না করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়াবে। এ কাজে প্রাদেশিক পত্র-পত্রিকাগুলো রাজধানীভিত্তিক বড় কাগজগুলো থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ★

ঘরোয়া

পরিচালনা

নিবারন চক্রবর্তী

ঘরোয়ার নতুন বিতর্ক 'ইংরেজি স্কুল আমাদের এখনও পরাধীন করে রেখেছে' যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের চিঠির আক্রমণ। তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে কয়েকটি চিঠি এ সংখ্যায় পত্রস্থ হল।

চিঠির ভাষায় ও বক্তব্যে প্রত্যাশিত শ্লেষ আছে, আছে জ্বালা। পত্রলেখকরা কেউ কেউ নিবারণ চক্রবর্তী সম্পর্কেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। আসলে বোধহয় এই প্রথম উলঙ্গ রাজাকে সোজাসুজি উলঙ্গ বলা হল। এ প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য আপাতত আমার ঝুলিতেই থাক। বরং প্রস্তুত হই আরেক ঝাঁক নতুন চিঠির জন্যে।

প্রসঙ্গত প্রস্তাবঃ ইংরেজি স্কুলে পড়ে যারা 'মানুষ' হয়েছেন, সুসভ্য হয়েছেন, সব বিষয়ে 'থ্যাংক য়ু' বলা মকসো করেছেন তারা তাদের বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় যদি আমাদের দুয়েকটি পত্রাঘাত করে বাধিত করেন তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে জানাবেনঃ তাদের বাড়ি গেলে চিড়ে মুড়ির মোয়া খেতে পাওয়া যায় কিনা, সুক্তো চচ্চড়ি রাঁধার ঐতিহ্য বজায় আছে কিনা, বাড়িতে গৃহদেবতা আছেন কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিসের পরাধীন ?

ইংরেজি স্কুল আমাদের এখনও পরাধীন করে রেখেছে। 'ঘরোয়া' আসরে আপনাদের নতুন বিতর্ক।...পরাধীন করে রেখেছে।' সত্যিই কি তাই ? কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কি কোন দেশকে পরাধীন করে রাখতে পারে ? বিশেষ করে কোন বহুভাষী দেশে-যেখানে একটি বিদেশী ভাষা কাজকর্ম চালানোর একমাত্র ভাষা-মাধ্যম। পরাধীনতা যেখানে সেখানে কোন জাতির ওপর কোন একটি বিশেষ ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমান ভারতে ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে সে রকম কোন ব্যাপার নেই।

অবশ্য ইংরেজি স্কুল সম্পর্কে আমাদের দেশে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মা-বাবাদের একটু বাড়াবাড়ির কথাটা স্বীকার করে নিয়েই বলছি যে, ইংরেজি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত মান বাংলা স্কুলের থেকে অনেক বেশি। কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক গ্রাজুয়েটকে দেখেছি তারা একটা নির্ভুল দরখাস্ত বা চিঠি লেখার যোগ্যতাও দেখাতে পারে না। কলেজ জীবন পার হয়ে আমরা যেদিকেই জীবিকার সন্ধানে ছুটি না কেন—কোথাও ঐ বিদেশী ভাষাটাকে এড়িয়ে যেতে পারছি কি ? কি সরকারি কি বেসরকারি—সব অফিসেই কাজকর্মের ভাষা ইংরেজি। শুধু ইনটারভিউ-ভিত্তিক চাকরি কেন, কোন ব্যবসা করতে গেলেও তো আমাদের ঐ বিদেশী ভাষাটির দ্বারস্থ হতে হয়।

আর একটি বিষয় চিন্তা করে দেখতে বলবো। তা হল 'ডিসিপ্লিন।' কথাটা অবশ্য আপনারাও স্বীকার করেছেন। 'ডিসিপ্লিন'কে নেক নজরে দেখাটা উচিত নয়। ঐ জিনিসটার অভাবে আমাদের দেশের যুবাশ্রেণী কোন পথে আজকে চলেছে ? রাস্তাঘাটে রকে বসে যে তরুণেরা বেলেল্লাপনা করে, মেয়েদের দেখে টিটকারি দেয়, খবর নিলে দেখা যাবে—ইংরেজি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা ওখানে নেই বললেই চলে। কারণ তারা একটু রিজারভড প্রকৃতির। ইংরেজি স্কুলে পড়ে তাদের যে মানসিকতাটা গড়ে উঠেছে তাতে কিছু পশ্চিমী রং থাকলেও আমাদের বর্তমান সমাজে সেটা কল্যাণকর। একটা অসুস্থ সমাজের মধ্যে কিছু ছেলেমেয়ে যদি সব কাজে কর্মে সুস্থ চিন্তাধারার পরিচয় দেয় তবে তাকে পরাধীন মানসিকতা বলা যায় না। কারণ কোন এক দেশের সাংস্কৃতিক প্রবাহ অন্য কোন দেশকে যদি প্রভাবিত করে, তবে তাকে নিশ্চয় পরাধীন বলা সমীচীন নয়। তাই 'দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিবন্ধক' যে ইংরেজি ভাষা, এ ধারণারও কোন ভিত্তি নেই। সংস্কৃতি হৃদয়ের তৃষ্ণা। বাংলা স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা কি সব সময় সংস্কৃতিবান হয় ? একশ ছেলেমেয়েকে প্রশ্ন করুন—দেখুন তাদের ক'জন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। ঐ পরীক্ষায় বসার জন্য যেটুকু সাহিত্য মুখস্থ করা। আবার একশটা ইংরেজি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করলে দেখবেন- তাদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কোন উন্নাসিকতা তো নেই-ই, বরং তারা সময় পেলেই দেশী বিদেশী সাহিত্য চর্চা করে। কারণ একটা স্টাডি-হ্যাবিট তাদের স্কুল কলেজ থেকেই তৈরি হয়ে গেছে। তারা কম কথা বলে, বাজে সময় নষ্ট করে না। আজীবন বেকারত্ব সহ্য করলেও তারা ওয়াগন ভাঙতে যাবে না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই তারা ধৈর্য সহ্যশক্তি এবং ভদ্রতার পরিচয় দেবে।

অবশ্য ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া শেখা ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক মা-বাবা যে অন্তঃসারশূন্য ঠাট-বাট বজায় রাখতে চান সেটা নিশ্চয় নিন্দার। তবে তাদের মত সাজার পেছনে যে মানসিকতাটা কাজ করে ---অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সে মানসিকতাটা ইংরেজি স্কুলে থেকে পাওয়া নয়। বরং বাংলা স্কুলেই তার জন্ম।

বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র বাংলা স্কুলের ফসল—সঙ্গে এটাও ভুললে চলবে না যে, মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাদের কাছে বাংলা সাহিত্যের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ; যাদের একজন 'মহাকবি', অন্যজন 'বিশ্বকবি' হয়ে আছেন, তাদের ছেলেবেলায় বেশ কিছুকাল শিক্ষা দীক্ষা বিশপস কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স শিক্ষায়তনে হয়েছিল।

কুন্তল মিত্র, শিবপুর

বিকল্প নেই

বছর দশ বারো আগে কলকাতার একটি খবরের কাগজে সাংঘাতিক একটা ছবি ছাপানো হয়েছিল—দ্বারভাঙ্গা হলের স্যার আশুতোষের মর্মর-মূর্তিটি মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।—ছাত্রদের এই কীর্তি দেখে সেই সময়ে আমরা সকলেই দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। কতিপয় বিপথগামী উগ্রপন্থী ছাত্রের উপর সবটুকু দোষ চাপিয়ে সে-যাত্রায় আমরা নিজেদের কাছে মুখরক্ষা করি—মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে।

আচমকা এমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে না গেলে ঘটনাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্যটা অত সহজে এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। আমাদের পবিত্র শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আদ্যন্ত সবকিছু ওই একটি ছবিতেই খুব স্পষ্ট ক'রে বলা হয়ে গেছে। এই ছবির গূঢ়-তাৎপর্য স্বীকার করে নেবার সাহস অথবা সামর্থ আমাদের সেদিনও ছিল না, আজও নেই।

আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখবার মূঢ় ব্যগ্রতায় আমরা প্রায় ভুলেই গেছি, যে ব্রিটিশরা এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—উপনিবেশ চালাবার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক উকিল-কেরানি তৈরি করা। আমাদের মানুষ করে তোলবার জন্য নয়, কেরানি করে দেবার জন্যই। ব্রিটিশদের এই ধূর্ততা আমাদের অগ্রজদেরও চোখে পড়েছিল। তাদের কেউ একে 'দাস বানাইবার সব চাইতে বড় ব্যবস্থা' বলে নিন্দা করেছেন, কেউ বলেছেন, 'গোঁফেশ্বর মিস্ত্রির কল', কেউবা বিধান দিয়েছেন যে সবকটি গ্রাজুয়েটকে পাকড়াও করে বঙ্গোপসাগরের জলে বিসর্জন দিয়ে আসা হোক। এমনকি কংগ্রেসী নেতারাও বারবার বলেছেন যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা না বদলালেই নয়।

তারপরে একদিন ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে এনে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়া হল। আমরা স্বাধীন হলাম। প্রায় আপনা থেকেই অমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর আমাদের প্রত্যয় হল যে অন্য সব সমস্যারও অমনি আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। ঔপনিবেশিক প্রশাসন দক্ষতার সঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রশাসন চালাবে, পুলিশেরা দেশ

প্রেমিক হবে, উকিলদের ন্যায়বোধ জন্মাবে এবং কেরানি তৈরি করবার সুবৃহৎ কল থেকেই পূর্ণাবয়ব মানুষ বেরিয়ে আসবে।

সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের এই শেষোক্ত আশাগুলো পূরণ হয়নি।) প্রশাসন আজ প্রতিপদে পর্যুদস্ত, পুলিশ আরও মারাত্মক রকম পুলিশ, উকিলের ন্যায়বুদ্ধি অধিকতর টনটনে, এবং স্কুল ও কলেজের পরীক্ষার সময় সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়। এই সবকিছুই আমরা জানি, আমাদের তবুও আশা, এই সবকিছুই একদিন আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।

ওই আশাতেই আজও আমরা ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে-গুজিয়ে স্কুলে দিয়ে আসি, নিয়ে আসি—অবশ্যই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যার পাঠক্রমের সঙ্গে দেশের ও দশের কোনরকম সম্পর্ক নেই। দেশের প্রয়োজনে এর উদ্ভাবন;তাও শেষ হয়ে গেছে—ব্যবস্থাটিকে তবুও চালু রাখা হয়েছে কেননা এর কোন বিকল্প নেই। গত বত্রিশ বছরে আমরা একটা বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভেবে উঠতে পারিনি।

এই সবই আমাদের জানা কথা। সবকিছু জেনে-বুঝেই তবুও আমরা আজ মরিয়া হয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ধরনা দিই। আমাদের অবস্থা সর্বস্বান্ত জুয়াড়ির মতো। খেলা ছেড়ে উঠে পড়বার মুরোদ নেই তাই অগত্যা খেলেই যাচ্ছি।

ধ্রুব মজুমদার, কলকাতা-১০

আছে, থাকবে

নিবারণ চক্রবর্তী মশাই মনে হচ্ছে ইংরিজি স্কুলের উপর ভারি খাপ্পা! ওরকম খাপ্পা তো আরো অনেকেই। তাতে কী আসে যায়? তথাকথিতই বলুন, আর খাঁটিই বলুন—ইংরিজি স্কুলগুলি ছিল, আছে এবং থাকবে। দিনে দিনে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটবে। কারণ তা না হলে মধ্যবিত্ত ঘরে যে-সব নতুন নতুন ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে তারা পড়বে কোথায়? ওদের তো একটা ঠাঁই চাই। আমাদের ছোট মফস্বল শহরেও শত্রুর মুখে চুনকালি দিয়ে ধীরে ধীরে ইংরিজি স্কুল বেড়েই চলেছে। কারণ আজকাল ছোট ছোট পরিবারের আধুনিকা মায়েরা পুরোনো আমলের প্রাইমারি স্কুল-টুল সত্যিই তেমন পছন্দ করতে পারছেন না। তাই দেখি ঘরে ঘরে মায়ে-বাপে খটাখটি। জেতে কিন্তু মায়েরাই। ফলে ইংরিজি স্কুলের কদর বাড়ে।

বেংলিশই বলুন আর ইংলিশই বলুন, এ সব স্কুল যে বেশ ভালো তাতে আমার কোন সংশয় নেই। ওরা মাইনে বেশি নেবে না কেন বলুন? জানুয়ারি মাসে দু' ধরনের স্কুল ঘুরে এলে দেখতেন প্রাইমারি স্কুলের দিদিমণিরা হয় উল বুনছেন আর না হয় গুলতানি করছেন; ছেলেমেয়েরা কলকল করে বেড়াচ্ছে। সব মিলে হরিহর ছত্রের মেলা। ওখানে পড়া শুরু হতে হতে সরস্বতী পূজার পর। জানুয়ারি মাসটা যেন ফালতু! অথচ তথাকথিত ইংরিজি স্কুলে বছরের গোড়া থেকেই পড়া শুরু হয়ে যায়। ওরা জানে: লোকে এমনি এমনি টাকা দেবে না। কাজ বুঝে নেবে। দেশশুদ্ধ লোক যখন কিছু একটার পিছনে ছুটছে তখন তার নিশ্চয়ই কোন গুণ আছে। তা অস্বীকার করে লাভ কী?

আর একটা কথা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো! ইংরিজি না জানলে আমাদের সমাজে এখনো কি ভালোভাবে টেকা যায়? না, যায় না। কই, আপনারা তো স্বাধীনতা এত বছর পরেও সরকারী কাজে ইংরিজি তাড়াতে পারলেন না! মিছিমিছি ইংরিজি স্কুলকে দোষ দিয়ে গায়ের ঝাল মেটানো কেন? যে দুটো ইংরিজি বলতে-কইতে পারে তাকে কে না সমীহ করে, কে না খাতির করে? এটা যদি বাস্তব সত্য হয়, তাহলে ইংরিজি স্কুলগুলির কোন দোষ নেই। ওরা ব্যবসা করছে করুক; বিনিময়ে যা দিচ্ছে তার বাস্তব মূল্য যে অনেক!

আমার স্থির বিশ্বাস: নিবারণ চক্রবর্তী মশাই যদি বিবাহিত হন এবং তার যদি ছোট ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে তাকে তার স্ত্রী ইংরিজি স্কুলেই পাঠাবেন। অন্তত যতদিন পারা যায়। এভাবেই চলছে, চলবে। লং লিভ ইংরিজি স্কুল!

প্রকৃতি দেচৌধুরী, রানাঘাট

ধরতাই বুলি

বিয়ে আর চাকরির এই দুই বাজারে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের যা দরদাম, বাকি সব ফক্কিবাজি। ভালো ইংরেজি জানা থাকলে ভাল চাকরি এবং সুন্দরী স্ত্রী পাওয়া যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে আই এ এস ও ইনজিনিয়ার স্বামী পেতেও হলেও লোরেটো-ডায়োসেশানে পড়া চাই। তাই ছোটবেলা থেকে এই বিদেশী ভাষাটি ভালভাবে শেখানোর জন্যে আমাদের সমাজের বাংরেজী মা-বাবারা দিশাহারা। তাদের কী দোষ? রক্তে তো তাদের পূর্বপুরুষের সেই স্বপ্ন 'থিংক ইংলিশ, ড্রিম ইংলিশ এ্যানড রাইট ইংলিশ' দুরারোগ্য ব্যাধির মত চিরপ্রবহমান। সামাজিক জীবনে স্বাদেশিকতা শুধু একটা ধরতাই বুলি। আজও বিদেশী সাহেব মেমদের ব্যবহৃত তৈজস পত্র এমন কি বাথরুমের কমোড পর্যন্ত রাজধানী দিল্লীতে অকশ্যান হলে কিনতে ভিড় করেন খদ্দরধারী আগ-মার্কা দেশ প্রেমিকরা।

ইংরাজ এদেশে এসে তার বশংবদ জমিদার মুৎসুদ্দী শ্রেণী তৈরি করেছিল নিজের স্বার্থে, তারাই হলো এদেশের চিন্তা জগতে প্রধান শরিক; বুদ্ধিজীবী, জননেতা, সমাজ সংস্কারক প্রভৃতি। কয়জন এসেছেন সমাজের নিচুতলার ভূমিহীন বিত্তহীন শ্রেণী থেকে? এই তথাকথিত শিক্ষার মূলেই ছিল গলদ। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইংরাজি জানা ব্যক্তিরা শিক্ষিত ব্যক্তি বলে সমাজে মান্যগণ্য হতেন। স্বাধীনতার পর এই মানসিকতা থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেননি। ইংরাজি স্কুলে পড়ালে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিরঙ্কুশ, তাই ইংরাজি স্কুলের এত রমরমা। এটা এখন 'স্ট্যাটাস সিম্বল'। শুধু ধর্মের প্রশ্নেই আমাদের সমাজ শ্রেণী বিভক্ত নয়, বিত্ত ও বিদ্যায় এ সমাজ শতধাবিভক্ত।

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের এ শিক্ষা ভাব শিক্ষা নয় ভাষা শিক্ষা'।—ইংরেজি জানা মানুষ এ সমাজে আজও কুলীন, অজ্ঞ মানুষের চোখে দ্বিতীয় ঈশ্বর। তাই সর্বহারা নেতাও তার বিলাতী ব্যারিসটারী বাগ্মিতায় মুগ্ধ করে দেন শিক্ষার আলোক বঞ্চিত মানুষদের। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন পরিচালক মশাই; আমাদের সমাজের সমস্ত কিছুতে ঘোড়ার আগে গাড়ি যুতে দেওয়া হয়েছিল, তাই আজ অসঙ্গতি সর্বত্র।

স্বপ্রতিম রাহা, কলকাতা-৭০০০০৮

শুধু দেশপ্রীতি?

ঘরোয়া আসরে নতুন প্রসঙ্গের বিতর্ক নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। পরিচালক প্রসঙ্গটিকে বিতর্কিত করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারলেন না বলে আমার মনে হলো। অন্তিমে যার নীট ফল আমাদের বুঝে (!) নিতে হয় ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির আর প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ 'এ সবই আমাদের জাতিগত হীনমন্যতা ও অনগ্রসর চিন্তাভাবনার দ্যোতক'।

ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তক কি ইংরেজরা? ইংরেজি শিক্ষা এসেছে বাঙালীর আপন আগ্রহে, রামমোহন রায় প্রভৃতি দূরদর্শী পুরুষদের সিদ্ধান্তে। আমাদের ইংরেজি শিখিয়ে ইংরেজদের বিশেষ কোন লাভ ছিল না। এ শিক্ষা শুধুমাত্র একটা বিদেশী ভাষা শিক্ষা নয়; বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সমগ্র আধুনিক যুগটার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এ কি কখনো সংস্কৃতের মাধ্যমে হতে পারতো কিংবা বাংলা? এখনো আমরা এতদূর অগ্রসর হইনি যে সমগ্র আধুনিক যুগটাকে বাংলার মানুষদের কাছে খাঁটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে দিতে পারবো। ইংরেজ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করব? তাহলে মেলবন্ধন কে করবে? আধুনিক যুগের সঙ্গে পরিচিত হতে ইংরেজি তো এখনও কাণ্ডারী।

শুধুমাত্র দেশপ্রীতির অজুহাতে যুগের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকবো এটা কি ঠিক?

শর্মিষ্ঠা সিমলাই, কলকাতা-২৬


আবিদ সুর্তি
সুজা
১৩
সুজার কথামতোই বিয়ে করবে বিন্দু। তাই জোট বাঁধল দুজনে।
পাত্র কোথায় ?
খুঁজে দেখতে হবে।
একটু সময় দিলে এখ্খুনি দেখে আসব।
ভোরের আগে না ফিরলে মেয়েটাকে জ্যান্ত দেখবে না।
প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে সুজা ছুটল।
সে ছুটছিল বাতাসের চেয়েও জোরে।
চোখের নিমেষে এসে পৌঁছল সেই মুদির কুটিরে।
পেন্নাম হই, রাজার রাজা !
মুদির ছেলেটা তখন মৃত্যু-শয্যায়।
প্রায় শেষ অবস্থা হজুর !
তোমার ছেলে কেমন ?
ডাক্তার বলেছে, রাতটাও টিকবেনা।
আর কী বলেছে ডাক্তার ?
(ক্রমশঃ)

ভারতীয় ক্রিকেটে প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ এসেছে

শাক্যদেব

অবশেষে প্যাকিস্তানী ক্রিকেটাররা কাগুজে বাঘ হিসেবে প্রমাণিত হলেন। অথচ প্রথমে যখন ঠিক হয়েছিল পাকিস্তান ভারতে আসছে ছটি টেস্ট খেলতে, আমরা ভেবেছিলাম : ভারতকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেবেন পাক ক্রিকেটাররা। কিন্তু দিন যতই কেটেছে পাকিস্তানীদের ওপর ভারতের থাবা ততই গেড়ে বসেছে। সিরিজ জিতে রাবার ছিনিয়ে নিয়ে ভারত প্রমাণ করল—কাগুজে বাঘরা শুধু ভয়ই দেখায়, হিংস্র মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।

খাতায় কলমে গত দু বছরে বোলারের হিসেবে ভারত খুবই ক্ষতিগ্রস্ত বলে আমরা মনে করেছিলাম। যে স্পিন অস্ত্রকে আমরা বিপক্ষদের বুকে শক্তিশেল হিসেবে ভাবতাম তা ক্রমেই ধার হারিয়ে ফেলায় আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। ভাবতাম কী দিয়ে কেমন ভাবে বিপক্ষের বাঘা ব্যাটসম্যানের মোকাবিলা করব! প্রসন্ন-বেদী-চন্দ্রশেখর এবং ভেংকট-রাঘবন সরে যাওয়াতে ভারতীয় ক্রিকেটে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল কোন অস্ত্র ঝড় হয়ে এসে সেই শূন্যতা ভরাট করবে সেই চিন্তাতেই ছিল্যাম মশগুল। অবশেষে দেখা গেল—যাদের আমরা অপরিহার্য বলে ধরে নিয়েছিলাম তাদের ছাড়াই অসট্রেলিয়া এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত রাবার জিতে নিল ড্যাং ড্যাং করে। প্রমাণিত হল এ দুনিয়ায় কারো জন্যই কিছু আটকায় না, কেউই অপরিহার্য নন।

অসট্রেলিয়া এবং প্যাকিস্তান সিরিজের ফলাফল নিয়ে আমি আলোচনা করব না। আলোচনা করব তিনটি দল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই কয়েকটি প্রশ্নের যা সঙ্গত কারণেই এসে পড়ে।

সফরকারী অসট্রেলীয়দের নাম ঘোষণা করার পর আমরা কিছুটা মনমরা হয়ে গিয়েছিলাম বৈকি। আশা ছিল টমসন, লিলি, গ্রেগ চ্যাপেল, প্যাসকো, রডনি মারশ, ম্যাকোট, লেয়ারদের খেলা দেখব। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিলেন অসট্রেলীয় বোরড। প্যাকার তারকাদের বাদ দিয়ে উঠতি, তরুণ ক্রিকেটারদের ভারত সফরে পাঠালেন তারা। একটা চ্যালেনজ ছোঁড়া হল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দোহাই দিয়ে। ভারত সেই চ্যালেনজ শুধুই গ্রহণ করল না, ২-০ ম্যাচে হারিয়ে এটা জানিয়ে দিল ওই দল এখনও শিক্ষানবীশ। আমরা অবশ্য দেখতে পেলাম—তারুণ্যে ডগমগ একটি দল যার কয়েকজনের মধ্যে বিরাট খেলোয়াড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে কথা যে ভুল নয় তার প্রমাণ এখন পাচ্ছি। সফরকারী ইংল্যানড এবং ওয়েস্ট ইনডিজের বিরুদ্ধে ভারত সফর করে ফিরে যাওয়া বেশ কয়েকজনের অন্তর্ভুক্তিতে। কিম হিউজ, অ্যালান বরডার, ডিমক, ইয়ালপ ক্রমেই বাঘা ক্রিকেটার হয়ে উঠছেন।

এরপর পাক ক্রিকেটাররা কাগজে কলমে আগুন ছুটিয়ে ভারতে এলেন। বিশ্ব ক্রিকেটের বিরাট বিরাট নামগুলিকে চাক্ষুষ করার উত্তেজনায় আমরা তখন কাঁপছি, আর হীনমন্যতায় ভুগছি। ওরে বাবা, ইমরান, কে খেলবে ওর বল? আসিফ, জাভেদ, ওয়াসিম রাজা, মজিদ, জাহির, সাদিক—পিটিয়ে ছাতু করবে যে সব! ক্ষীণ আশা জেগেছিল সরফরাজ নওয়াজ না আসায়। যাক একদিক দিয়ে তো নিশ্চিন্ত!

তারপর একটি একটি করে টেস্ট শেষ হয় আর আমরা ক্রমেই বল পাই বুকে। বোমবাই টেস্টে প্যাকিস্তানকে হারাবার পর হীনমন্যতা কিছুটা কাটল। আর পুরোপুরি কেটে গেল মাদরাজ টেস্টে দশ উইকেটে জেতার পর। তবুও, ভারতের ক্রিকেটকে যারা বিশ্ব আসনে বসাতে নারাজ তারা বলতে থাকেন—ওরা খেলতে পারেনি বলেই আমরা জিতেছি, আমরা ভালো খেলেছি বলে ওরা পারেনি। যুক্তিটা হাস্যকর, কিন্তু ফেলে দেবার মতো নয়।

একথাটা ঠিকই যে পাকিস্তানীরা আশানুরূপ খেলতে পারেনি। ইমরান জুজু হয়ে উঠতে পারেননি। তারপরও পিঠের ব্যথায় একটি টেস্টে তো খেললেনই না; আর একটি টেস্টে নামমাত্র বোলিং করলেন দু-চার ওভার। অতবড় ওপেনিং ব্যাটসম্যান মজিদ খান নেহাত ছেলেভুলোনো ক্রিকেট খেললেন সারা সিরিজে। জাহির আব্বাসকে তো

খেলাধুলা

খেলা ভুলিয়েই ছেড়ে দিলেন কপিল, ঘাউড়ি, দোশি, বিন্নিরা। শেষ টেস্টে বাদ। আসিফ ইকবালই বা কী এমন রান করলেন? জাভেদ মিয়াঁদাদ কিছুটা খেলেছেন তাও মাঝারি গোছের। খেলেছেন শুধু ওয়াসিম রাজা; যতটা সাধ্য ততটুকুই উজাড় করেছেন। দুর্ভাগ্য দুটি সেনচুরি পেতে পেতেও উনি পাননি। সঙ্গীবিহীন ৯৩-এ একবার নট আউট রইলেন আর একবার ৯৭-এ লেগ বিফোর উইকেট আউট হলেন। সিদ্ধান্তটিতে তিনি মনঃক্ষুন্নই হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে দলনায়ক আসিফ টেস্ট আঙিনা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাংবাদিকদের স্পষ্ট বলে দিলেন তার দলের ব্যাটসম্যানেরাই ডুবিয়েছেন। এ নিয়ে পাক পত্র-পত্রিকায় ফলাও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আসিফের সমালোচনায় সোচ্চার হল পাক সংবাদপত্রগুলি। এবং ক্রমেই একটা বিষয় পরিষ্কার হল—প্যাকিস্তানী শিবিরে কাজিয়ার গন্ধ রয়েছে। এতদিন এ নিয়ে কানাঘুষো হচ্ছিল ; এবার তা প্রকাশ পেল।

পাক শিবিরের ব্যর্থতা কি শুধুই দলীয় উপদলীয় কোন্দলের জন্য? একমাত্র কারণ হয়তো নয়, তবে তা অন্যতম কারণ নিশ্চয়। ভারতীয় কৃতিত্বকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেও বলতে হয়—দলীয় ঝগড়া না থাকলে, সফরে কয়েকজনের সঙ্গে কয়েকজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ না থাকলে সরফরাজ এবং মুস্তাক মহম্মদ ছাড়াই এই দলই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারতো।

ঠিক উল্টো অবস্থাটা ভারতীয় শিবিরে। গাভাসকর অধিনায়কের দায়িত্ব নেবার পর নিজের ব্যক্তিত্ব আর বিরাটত্বকে মূলধন করে এমন কয়েকটি ব্যাপার করে গেছেন যাতে ভারতীয় ক্রিকেট সমৃদ্ধশালীই হয়েছে। সব থেকে বড় কথা গাভাসকর-বিশ্বনাথরাই ভারতীয় ক্রিকেটে 'প্রোফেশনাল অ্যাপ্রোচ' এনেছেন। ক্রিকেট কনট্রোল বোরডের সঙ্গে দর কষাকষি করে তারা, মানে তাদের সংস্থা, দক্ষিণার পরিমাণটি পাঁচগুণ বাড়াতে পেরেছেন। এতে সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে ক্রিকেটারদেরই। কমপিটিশন বেড়েছে। আরও ভাল খেলার তাগিদও তারা পাচ্ছেন। এটা ঠিক যে কোনো ভাল জিনিস পেতে হলে দাক্ষিণার পরিমাণও ভাল হওয়া চাই। তা সে খেলাধুলোই হোক আর শিল্প সাহিত্যই হোক।

স্পিনারদের মুখ্য ভূমিকায় বর্তমানে এসেছেন পেসাররা। আমরা পাঁচ বছর আগেও কল্পনা করতে পারিনি ভারতীয় দলে তিনজন রেগুলার পেস বোলার রয়েছে এবং এক একটা ইনিংসে ৭০-৮০ ওভার বল করছে। অথচ এটা এখন বাস্তব। দলে এখন তিন-চারজন করে পেসার ভাবা যায়? ভাবা যায় মানকড়, সুভাষ গুপ্তে, প্রসন্ন, বেদী, চন্দ্রশেখর এবং ভেংকটরাঘবনের পর সপ্তম ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি শততম উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি পেসার? কপিল ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে উঠতি পেসারদের যে কতটা অনুপ্রাণিত করেছেন তা স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। কপিল দেব ভারতীয় ক্রিকেটকে একটা নতুন শিরোপা পরিয়েছেন। ক্রিকেট যে মরদের খেলা, তরুণ কপিলের বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে তা প্রমাণিত।

কপিলের সাফল্যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পাওয়ার কথা উঠতি পেসারদের। উঠতিরা এখন এটা বুঝতে পেরেছে যে জোরে বল করলে এবং ভাল করলে টেসটে চানস পাওয়া যাবে। সুযোগ হিসেবে অন্তত দশ-পনের ওভার হাত ঘোরাতেও পারবে। এইখানে একটা কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এদেশে ক্রিকেটের পিচ যারা তৈরি করেন আরও স্পোর্টিং পিচ তৈরির জন্য তারা যেন নজর দেন। পেস বোলাররা তাহলে আরও কার্যকর হবেন। উপকৃত হবেন ব্যাটসম্যানেরাও। কারণ বিশ্ব ক্রিকেটে স্পিনারদের ঘাটতি ক্রমশই বড় বেশি করে দেখা দিচ্ছে। এ-ক্লাস স্পিনারদের মধ্যে এখন টিমটিম করে জ্বলছেন আনডারউড ও মুসতাক মহম্মদ। রাজত্ব করছেন পেসাররা। ভারতের অবস্থাও তাই। সুতরাং ফাস্ট উইকেট তৈরি হলে ক্ষতির থেকে লাভ বেশিই হবে ভারতীয় ক্রিকেটের।

মাঝে এমন একটা অবস্থা এসেছিল যখন ভারতীয় একাদশে এগার জনের মধ্যে ভালো ফিলডার ছিলেন দু-তিনজন। বাদবাকি সবাই মাঠে নেমে ছুটতেন ডীপ ফাইন লেগ বা থারডম্যান অঞ্চলে। এখন অবস্থাটা ঠিক উল্টো। এগারোজনের মধ্যে দশজনই প্রায় বাঘা ফিলডার। টেসটে এসে প্রায় বৃদ্ধ দোশিও মিড অন থেকে বাউনডারি পর্যন্ত বল চেজ করছেন, অবধারিত বাউনডারি আটকাচ্ছেন। আগে ক্যাচ পড়ত গণ্ডায় গণ্ডায়, এখন অসাধারণ ক্যাচ ধরে হাফ চানসকে ফুল করে ম্যাচ জিতে যাচ্ছেন ভারতীয়রা। এসবই প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং ওই প্রোফেশনাল অ্যাপ্রোচের সুফল।

ইদানিং আরও একটা জিনিস চোখে পড়ার মতো। গাভাসকর-বিশ্বনাথ আউট হয়ে গেলে ভারতীয় ক্রিকেট এখন আর অভিভাবকহীন হয়ে পড়েনা। কেউ না কেউ এসে ঠিক দায়িত্ব পালন করে যান। এইতো ইডেনে শেষ টেসটে ৯৯ এর মধ্যে গাভাসকর, বিশ্বনাথ, চৌহান, বিনিকে হারিয়েও ভারত ৩৩১টি রান তুলল। এ নজীর এ সিরিজেই প্রথম নয়। অসট্রেলিয়ার সফরের সময় একাধিকবার এ জিনিস দেখা গেছে। লাইন দিয়ে ফিরে যাওয়ার অবস্থা আগের মতো এখন আর হামেশাই হয় না। বা দু' একজনের ওপর নির্ভর করেই ভারতীয় ইনিংসের ইমারত এখন তৈরি হয় না। দায়িত্ব এখন যে কেউ নিতে পারেন। টিমের অ্যাপ্রোচ প্রোফেশনাল না হলে এগুলো হয় না। সুখের বিষয় ভারতীয় ক্রিকেটে এখন এগুলি এসেছে।

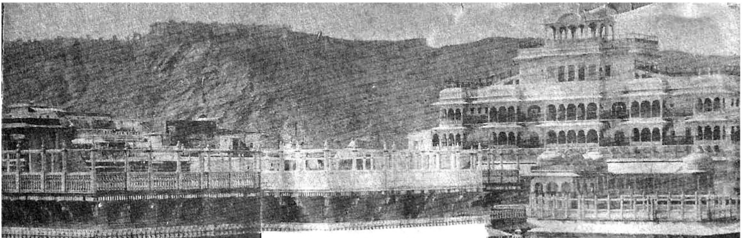
এর জন্য গাভাসকর-বিশ্বনাথ সমেত ভারতীয় ক্রিকেটের অভিজ্ঞ চরিত্রগুলি প্রথম বাহবা পাবেন। বাহবা তারপরই পাবেন দলের উঠতি, তরুণ ক্রিকেটাররা। শেষে আসছেন ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোরডের হর্তাকর্তারা। ওদের অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল, অনেক সময় ক্রিকেটারদের ভালোমন্দ ক্রিকেটাররাই ভালো বোঝেন, বোরড নয়।

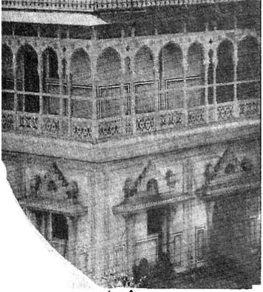
পাকিস্তান ভারতের কাছে জুজু হয়ে উঠতে পারেনি। সুবিধা অবশ্য আমাদেরই ছিল বেশি। নিজেদের মাঠ, নিজেদের সমর্থক। তবুও ভারতের এই সাফল্য এককথায় দারুণ। ভারতীয় ক্রিকেট এবং ক্রিকেটাররা যে এখন আর হীনমন্যতায় ভোগেননা এটা প্রমাণিত গত এক বছরে। হীনমন্যতায় আমরা সাধারণ মানুষও যেন আর না ভুগি। ★

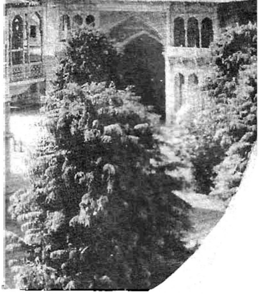


ইডেনে শততম উইকেট পাবার পর কপিলকে আদর করছেন বিশ্বনাথ, পাশেই গাভাসকর ও অন্যরা

আলোকচিত্র : অরুণ মুখারজি





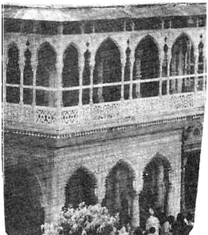


বাঙালী ব্রাহ্মণ জয়পুর শহরের নকশা তৈরি করেছিলেন

জ্যোতির্ময় দাশ

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তপ্রদেশ রাজস্থান দেশে বিদেশে যে দুটি কারণে সর্বাধিক পরিচিত তার একটি হল বিশাল-বিস্তৃত মরুপ্রান্তর থর আর অন্যটি গোলাপী শহর জয়পুর। স্বদেশী পর্যটকদের কাছে শহর জয়পুরের আকর্ষণ সীমাহীন। আড়াইশো বছরের এই পুরানো শহরটি তার বিশিষ্ট নগর-পরিকল্পনা, তার গঠন-সৌকর্য, তার বিখ্যাত প্রাসাদ মন্দির প্রভৃতি নিয়ে এক অখণ্ড দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে।

অম্বরের কাচ্ছাওয়া রাজপুতবংশের মহারাজা সওয়াই জয়সিং দ্বিতীয় (১৬৯৯-১৭৪৩) সামরিক গুরুত্ব এবং ব্যবহারিক সুবিধার কারণে জয়পুর শহরের পত্তন করে-ছিলেন ১৭২৭ সালে। সরকারী পর্যটন বিভাগ ১৯৭৭-র নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই ঐতিহাসিক শহরটির স্থাপনার আড়াইশো বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। একটি শহরের মাত্র দুশো পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার ঘটনার মধ্যে যদি কেউ বিশেষত্বের কোন কারণ বা সেই উপলক্ষটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের মধ্যে কোন তাৎপর্য খুঁজে না পান তাহলে তাদের জন্য বলতে হয় যে বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত ঐতিহাসিক শহরগুলি আজও ব্যবহার্য বা বসবাসযোগ্য, জয়পুর তার মধ্যে একটি দুর্লভ নিদর্শন। এই সম্পূর্ণ নগরটির পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে সেই সুদূর অতীতে বিশেষ উন্নতমানের এক স্থাপত্য শিল্প শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলা হয়েছিল। অর্থাৎ সম্পূর্ণ শহরটি শাস্ত্র-সম্মত ভাবে পরিকল্পিত ও নির্মিত হবার পর বসবাসের জন্যে জন-সাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আলেকজান্ডারের রাজত্বকালের (খৃঃ পূঃ



৩৫৬-৩২৩) আগে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য-বিদ মানসরা রচিত 'বাস্তুশাস্ত্র' যে যথেষ্ট উন্নত ছিল তার প্রমাণ এই শহরটি। যুদ্ধ ও মহা-কালের করাল স্পর্শ এড়িয়ে তার স্থাপনার আড়াইশো বছর পরেও আধুনিক সভ্যতার উন্নত এবং বহুগুণে বর্ধিত জনসাধারণের প্রয়োজন ও চাহিদা নির্বিঘ্নে মিটিয়ে চলেছে।

কাচ্ছাওয়ারা নিজেদের অযোধ্যার সূর্য-বংশীয় রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলে মনে করেন। সূর্য এদের উপাস্য দেবতা এবং রাজ্যের সরকারী কাজকর্মে এরা সূর্যের প্রতীকচিহ্নটি ব্যবহার করতেন। জয়পুর স্থাপনার আগে কাচ্ছাওয়াদের রাজত্বকে ঢুঁচার রাজ্য বলা হত এবং সে সময়ে রাজধানী ছিল বর্তমান জয়পুরের পাঁচমাইল উত্তরে অম্বর শহরে। অম্বর শব্দটি মহাদেব-পত্নী অম্বা-দেবীর স্মরণে শহরের পূর্বনাম 'অম্বাবতীর' অপভ্রংশ—স্থানীয় জনসাধারণ শহরটিকে 'আমের' বলে উল্লেখ করে। মহারাজা সওয়াই জয়সিং দ্বিতীয় এবং তার পূর্বজ অন্য সাতাশজন রাজা ১০৩৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৩০ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় সাতশো বছর অম্বরে রাজত্ব করেছিলেন। রাজা বিহারীমল, যিনি ভারমল বা পূরণমল (১৫২৭-১৫৩৩ নামেও পরিচিত, সর্বপ্রথম বাবরের সঙ্গে সন্ধি করে দিল্লি ও অম্বরের মধ্যে একটা সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী কালে রাজা মান সিং (১৫৯০-১৬১৪ খৃঃ) সম্রাট আকবরের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু এবং প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন। মানসিংয়ের সময় থেকেই কাচ্ছাওয়ারা ক্রমশঃ শক্তিতে ও সম্পদে পরাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু দিল্লির সম্রাটের প্রয়োজনে তাদের বেশির ভাগ সময়ই অম্বরের বাইরে বাইরে কাটাতে হত। মহারাজ সওয়াই জয়সিং আওরঙজেবের রাজত্বের ৪[illegible] বর্ষে অর্থাৎ

তার মৃত্যুর ৬ বছর আগে অম্বরের সিংহাসনে বসেন। আওরঙজেবের মৃত্যুর পর মোগলদের সঙ্গে কাছোয়াদের সম্পর্ক আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আওরঙজেবের মৃত্যুর পর দিললির মসনদে উত্তরাধিকারীর লড়াইয়ে জয়সিং আজমশাহের পুত্র বেদারবক্তের পক্ষ নিয়েছিলেন। রাজস্থানে ধোলপুরের কাছে জাজো সরায়ের যুদ্ধে বেদারবক্ত ও তার পিতার মৃত্যু হয় এবং আওরঙজেবের দ্বিতীয় পুত্র মো-অ জুম বাহাদুর শাহ (শাহ-আলম) নামে সিংহাসনে বসেন। বেদারবক্তের পক্ষ নেওয়ার জন্য বাদশাহী সেনারা অম্বর দুর্গ অবরোধ করে, কিন্তু জয়সিংয়ের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়। জয়সিং সে সময়ে প্রায় সমগ্র রাজপুতানার অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজা। অম্বরের মত ছোট রাজ্যকে তিনি এক বিশাল রাজ্যপ্রদেশে পরিণত করেছিলেন।

তিনি একাধারে যেমন অত্যন্ত কুশলী যোদ্ধা ছিলেন তেমনি বিজ্ঞান ও সুকুমার কলার একজন বিজ্ঞ বোদ্ধা ছিলেন। মোগল সম্রাটের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি রাজ্যের কাঠামোটিকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলার কাজে এবং শিল্প সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। অম্বরের ছোট পরিসর তার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দুর্ধর্ষ মারাঠাদের আক্রমণের হাত থেকে নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাজধানী স্থানান্তরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। নতুন রাজধানী তৈরির পরিকল্পনা এবং স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে বহু গল্প প্রচলিত থাকলেও পাহাড়ের ওপর দুর্গ শহর অম্বরের জলকষ্ট, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও সেনাবাহিনীর আবাসের অসুবিধা এবং প্রাচীন রাজধানীর নৈকট্য প্রভৃতি যে রাজাকে বর্তমানস্থান নির্বাচনে প্রভাবিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহেই নেই। সেসময়ে এই স্থানটি তালকাটোরা, মোতিকাটলা, গলতাজী, কিশানপোল, নাহারগড় এবং সন্তোষ নগর নামে ছটি গ্রাম, বনজঙ্গল এবং টিলা ও জলাশয় নিয়ে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

মহারাজ নিজে জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত হলেও জয়পুর শহরের নকশা তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিদ্যাধর চক্রবর্তী নামে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ স্থপতিকে। কাছোয়া রাজবংশের সঙ্গে বাংলা ও বাঙালীর যোগাযোগ যথেষ্ট আন্তরিক এবং নিবিড়। মহারাজ মানসিং আকবরের নির্দেশে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়কে তার হাতে পরাজিত হতে হয়। শোনা যায় প্রতাপাদিত্য সম্রাটের সেনাবাহিনীকে তীব্রভাবে প্রতিহত করেন। যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে মানসিং প্রতাপাদিত্যের আরাধ্য বিগ্রহ শিলাদেবীর শতচণ্ডী যজ্ঞ পূজা করেছিলেন। বিজয়ী হয়ে ফেরার সময় শিলাদেবীকে তিনি সঙ্গে করে আনেন এবং অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। (স্থাপনার সময় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও সাধারণভাবে ধরা হয় শিলাদেবীর অম্বরে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৬০৮-থেকে ১৬১৩ খৃঃ মধ্যে) দেবীর নিত্যপূজার জন্যে সেই সময়ে তিনি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য নামে এক বিদ্বান বৈদিক বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারকেও নিয়ে এসেছিলেন। বংশ পরম্পরায় আজও তারাই শিলাদেবীর পূজা করে আসছেন। এই পূজারী বংশেরই এক বংশধর কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য একসময়ে জয়সিংয়ের মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যাধর চক্রবর্তী কৃষ্ণরামের ভাগে। (তার পিতার নাম সন্তোষরাম চক্রবর্তী, জন্ম ১৬৯৪ খৃঃ মাত্র ৫৮ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয় সওয়াই মাধোসিং প্রথমের রাজত্বকালে ১৭৫২

অতি অল্পবয়স থেকেই বিদ্যাধর যে বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন সে সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে। মহারাজ জয়সিং একদিন দেওয়ান কৃষ্ণরামের সঙ্গে অম্বরে মতি মহল প্রাসাদ তৈরির কাজ দেখছিলেন। মহারাজ প্রাসাদের ছাদে যাবার জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে এমন একটি সিঁড়ি তৈরি করার বাসনা জানান। কিন্তু স্থপতি ও কারিগরেরা কেউই তার পছন্দ মত কোন নকশা তৈরি করতে পারে না। কিশোর বিদ্যাধর মামার সঙ্গে সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার পরের দিনই তিনি মোমের তৈরি ঘোরানো সিঁড়ির একটি মডেল রাজাকে দেখিয়েছিলেন। মডেলটি দেখে মহারাজা অত্যন্ত খুশি হন এবং উচ্চশিক্ষার জন্যে নিজের খরচখরচায় বিদ্যাধরকে কাশীতে পাঠালেন। বিদ্যাধর বাস্তুবিদ্যা, গণিত এবং রাজনীতিতে বিশেষ নিপুণ জ্ঞানলাভ করেন। পরবর্তীকালে জয়পুর নগর পরিকল্পনা ও জ্যোতিষ-মানমন্দির (যন্তর-মন্তর) স্থাপনার ব্যাপারে তিনি জয়সিংয়ের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

পুরানো জয়পুর শহর প্রায় বর্গ-



ক্ষেত্র আকারের এবং নয়টি 'চোকরিতে' (বিভাগে) বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম কোণে অম্বরের পাহাড়ী অঞ্চল বর্গক্ষেত্র আকারে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছে। নয়টি বিভাগ স্বর্গের ঐশ্বর্য দেবতা কুবেরের নয়টি কোষাগার বা ভাণ্ডারের কল্পনায় গঠিত। কেউ কেউ মনে করেন তালকাটোরা হ্রদের ধারে নির্মিত রাজপ্রাসাদ চন্দ্রমহল সুমেরু পর্বতের প্রতীক এবং শহরের নয়টি বিভাগ ব্রহ্মাণ্ডের নয়টি গ্রহের প্রতিনিধি। পাহাড়ী এলাকার জন্যে উত্তর-পশ্চিম কোণে নবম বিভাগটির কোন স্থান না থাকায় সেটিকে শহরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আলাদা বর্গাকারে রাখা হয়েছে। এই নয়টি 'চোকরি' বা বিভাগের নাম—চন্দ্রমহল, চোকরি রামচন্দ্রজী, চোকরি গঙ্গাপোল, তোপখানা হুজুরী, ঘাট দরওয়াজা, চোকরি বিশ্বেশ্বরজী, চোকরি মোদিখানা, তোপখানা দেশ এবং পুরানা রাস্তা।

জয়পুরের অন্যতম তিনটি প্রধান বিশেষত্ব হল ক) শহরের সমস্ত রাস্তা পূর্ব-পশ্চিম অথবা উত্তর দক্ষিণে সোজাসুজি বিস্তৃত। খ) শহরের প্রধান বাজারগুলি সব একই ধরনের দেখতে অর্থাৎ বাজারের সমস্ত দোকানপাটের আয়তন, কারুকাজ করা সামনের ঝুল বারান্দা, নামপাট্টের (সাইন বোর্ড। আকার প্রভৃতি সমান, এবং গ) শহরের সমস্ত ঘরবাড়ি বাজার প্রাচীর প্রভৃতির গোলাপী রঙ। এই বিশেষ রঙের জন্যেই শহরটি গোলাপী নগর (পিংক সিটি) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জয়পুরকে অবশ্য 'গোলাপী নগর' না বলে মণ্ডপাকার প্রবেশদ্বারের শহর কিংবা মন্দিরময় নগর বললেও ভুল হবে না। কারণ এখানে প্রতিপদক্ষেপে পথের ধারে একটি মন্দির এবং শহরের প্রতি সীমান্তে এক বা একাধিক পথের শুরুতে বা শেষে আশ্চর্য সুন্দর শিল্পমণ্ডিত তোরণাকৃতি প্রবেশদ্বার দেখতে পাওয়া যায়।

শহরের প্রধান রাজপথটি পূবের সুরজপোল থেকে শুরু হয়ে একেবারে সোজা পশ্চিমের চাঁদপোলে গিয়ে শেষ হয়েছে। রাজপথটিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত অন্য তিনটি প্রধান রাস্তা সোজাসুজি বিভক্ত করে চলে গেছে। এই তিনটি সঙ্গমস্থলে তিনটি 'চৌপড়' বা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। পশ্চিমের দিক থেকে প্রথম চৌপড়ের নাম আমের কি চৌপড় বা ছোটী চৌপড়, মধ্যেরটিকে সাঙ্গানের বা মানক বা বড়ী চৌপড় এবং তৃতীয়টিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকেরটিকে ঘাট দরওয়াজে কি চৌপড় বা রামগঞ্জ চৌপড় বলে। প্রধান রাজপথগুলি ১০৮ ফুট চওড়া, অন্য রাস্তা তার অর্ধেক ৫৪ ফুট চওড়া এবং বাকি রাস্তাগুলি তারও অর্ধেক অর্থাৎ ২৭ ফুট চওড়া। রাস্তাগুলির এই প্রশস্ততার দরুন আড়াইশো বছর পরেও শহরটির সীমাহীন জনসংখ্যা ও যানবাহনের চাপ সহ্য করতে কোন অসুবিধা

হচ্ছে না। শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে পাহাড়ের ওপর সুদর্শনগড় দুর্গ (স্থানীয় লোকেরা দুর্গটিকে 'নাহার গড়' বলে থাকে। 'নাহার' শব্দের অর্থ সিংহ। যে পাহাড়ের ওপর দুর্গটি স্থাপিত সেটি আকারে সিংহের মত বলে নামটি প্রচলিত) এবং পূর্বে সুরজ পোলের কিছু দূরে গলতাজীর পাহাড়ে সূর্য মন্দির শাশ্বত প্রহরীর মত শহরটিকে যেন পাহারা দিচ্ছে।

মহারাজ জয়সিং এই তিনটি চৌপড়ের চারকোণে উৎকৃষ্ট স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য কিছু ভবন ও মন্দির তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কয়েকটি কোণায় গম্বুজওলা হাভেলী ও মন্দির (রামগঞ্জ চৌপড়ে মুরলীমনোহরের মন্দির) প্রভৃতি নির্মিত হলেও আকস্মিক মৃত্যুতে জয়সিং তার বাসনা পূর্ণ করতে পারেননি। তার পরবর্তী রাজারা কেউ কেউ বিদগ্ধ শিল্পবিদ হলেও নিজেদের চিন্তাধারা অনুযায়ী এসব কাজ সমাধা করেছিলেন তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্পগত সমতার অভাব দেখা যায়।

শহরের মধ্যস্থলে শহরের সম্পূর্ণ আয়তনের প্রায় একের সাত ভাগ অংশ জুড়ে রাজপ্রাসাদের বিস্তৃতি। প্রাসাদ চত্বরে প্রধান ভবনগুলি হল চন্দ্রমহল, দিওয়ানখানা, দিওয়ান-ই-খাস বা সর্বতোভদ্র, মুবারক মহল, প্রীতম নিবাস, জানানা দেউরী, জয় নিবাস বাগান ও সংলগ্ন গোবিন্দদেবের মন্দির, তালকাটোরা হ্রদের পারে বাদল মহল, জালেব চক, যন্তর-মন্তর, চাঁদনীচকের দু'পাশে আনন্দবিহারী এবং ব্রজনিধির মন্দির, ঈশ্বরীলাট বা স্বর্গশূলীসহ অতিশ। প্রাসাদে প্রবেশের কয়েকটি তোরণদ্বার সত্যিই রাজকীয় এবং তার মধ্যে দুন্দুভী পোল বা নক্কারখানা দরওয়াজা শিল্প ও সৌন্দর্যে অনবদ্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে জয়সিং গণিত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষ গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি দিল্লি, জয়পুর, মথুরা, উজ্জয়িনী এবং বারাণসীতে মানমন্দির তৈরি করেছিলেন। এর মধ্যে দিল্লিরটি প্রথমে স্থাপিত হলেও জয়পুরের মানমন্দিরটি শ্রেয়। স্থাপত্য বিদ্যার নিরিখে যন্তর-মন্তর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মহারাজ জয়সিং যদি আর কিছু না করে কেবলমাত্র একটিই যন্তর-মন্তর তৈরি করতেন তাহলেও পৃথিবীর ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকতো। একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন মহারাজ জয়পুর শহর পত্তনের আগে এই যন্তর-মন্তর তৈরি করেছিলেন এবং মান-মন্দিরের বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে গাণিতিক নির্ণয় অনুযায়ী শহরের স্থাপনা করেছিলেন।

সিটি প্যালেসের (বর্তমানে মহারাজ সওয়াই মানসিং দ্বিতীয় জাদুঘর) পুঁথিখানায় রক্ষিত একটি পাট্টা (দানপত্র) থেকে জানতে পারা যায় ১১ নভেম্বর ১৭২৭ খৃস্টাব্দে চন্দ্রমহলের ভিত্তি স্থাপনের সময় পণ্ডিত জগন্নাথ সম্রাট বাস্তুশান্তি, বিনায়কশান্তি এবং নবগ্রহশান্তির জন্য যে পূজা-অর্চনা প্রভৃতি করেন সে উপলক্ষে খরচ হয়েছিল মোট ১০৮৩ টাকা ৫ আনা। দক্ষিণা হিসাবে পূজারী মশাইকে মহারাজ আট বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। সমগ্র শহরটিকে ঘিরে তার সুরক্ষার জন্যে প্রাচীর, বিশাল তোরণময় প্রবেশদ্বার, দোকান-বাজার, প্রাসাদ-হাভেলী-সাধারণ ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ভূগর্ভের পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি অর্থাৎ বসবাসের উপযোগী প্রায় সব কিছুই ১৭৩০ খৃঃ নাগাদ শেষ হয়ে আসে এবং ঐ বছরই অম্বর থেকে রাজধানী জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সিটি প্যালেস মিউজিয়ামে রাখা (চন্দ্রমহল ও সংলগ্ন কয়েকটি ভবন রাজাদের সংগ্রহ করা বহু দুর্লভ ও মূল্যবান জিনিসপত্রের সঞ্চয় নিয়ে ১৯৫৯ সালে একটি ট্রাস্টের পরিচালনায় মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে) বিভিন্ন নথিপত্র, মানচিত্র, নকশা প্রভৃতি থেকে জানা যায় বিদ্যাধর প্রথমে প্রাথমিক নকশা তৈরি করে মহারাজের অনুমোদন করিয়ে নিতেন এবং সেইমত সমস্ত কাজ খুবই নিপুণতার সঙ্গে দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হত। মহারাজ নিয়মিত নির্মীয়মাণ শহরে এসে কাজের অগ্রগতি পরীক্ষা করতেন, প্রয়োজনে নানান ক্ষেত্রে পরিকল্পনার তাৎক্ষণিক সংশোধনও করতেন। দীর্ঘসূত্রতার কোথাও কোন অবকাশ ছিল না।

নতুন শহরের নাম মহারাজের নামের অনুকরণে প্রথমে 'সওয়াই জয়পুর' রাখা হয়েছিল কিন্তু কালক্রমে 'সওয়াই' শব্দটি বাদ পড়ে যায় এবং শহরটি শুধু 'জয়পুর' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। 'সওয়াই' শব্দটি আসলে একটি সম্মানসূচক উপাধি। শৌর্য বীর্য দেশপ্রেম ধর্মপরায়ণতা এবং পাণ্ডিত্যে জয়সিং দ্বিতীয়কে রাজপুত রাজাদের মধ্যে একের বেশি অর্থাৎ 'সওয়া' বলে গণ্য করা হত। মোঘল সম্রাট আওরংজেব এই



খেতাবটি জয়সিংকে দিয়েছিলেন এবং তার উত্তরপুরুষেরা সকলেই নামের আগে বংশ পরম্পরায় এটিকে ব্যবহার করতেন। বিশ ফুট উঁচু এবং ন'ফুট চওড়া প্রাচীর বেষ্টিত শহরে প্রবেশের জন্যে সাতটি সুপরিকল্পিত এবং সুসজ্জিত বিশাল সদর দরোজা ছিল।

প্রবেশদ্বারগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত—যেমন পশ্চিম দিকে চাঁদপোল (রাজস্থানীতে 'পোল' শব্দের অর্থ দরোজা), দক্ষিণে কিশনপোল (বর্তমান নাম আজমেরী দরওয়াজা), শিবপোল (সাঙ্গানের দরওয়াজা), রামপোল (ঘাট দরওয়াজা), পূর্বদিকে সূরজ-পোল এবং গঙ্গাপোল এবং উত্তরে ধ্রুবপোল (জোরাবর সিং-কা দরওয়াজা)। এই প্রবেশদ্বার থেকেই শহরের প্রধান পথগুলি শুরু অথবা শেষ হয়েছে বলা চলে। (দক্ষিণে আজমেরী দরওয়াজা এবং সাঙ্গানের দরওয়াজার মধ্যে বর্তমানে নূতন দরোজা বা 'নিউ গেট' নামে পরিচিত। আগে এখানে শহরের সীমান্ত প্রাচীর ছিল—নূতন দরোজা সাম্প্রতিক-কালের সংযোজনা এবং অন্য প্রবেশদ্বারের মত এর শিল্প কাজের মান তেমন উন্নত নয়।

বিদ্যাধর শহরটির পরিকল্পনা বড় সুন্দরভাবে করেছিলেন। শহরের প্রধান ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র প্রাসাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠেছিল, যেমন ত্রিপোলিয় বাজার, জোহরী বাজার, রামগঞ্জ বাজার, সিরেহ দেওড়ী বাজার, কিশনপোল বাজার, চাঁদপোল বাজার ইত্যাদি। এই বাজারের সীমানার পরই ছড়িয়ে আছে জয়পুরের প্রসিদ্ধ হস্তকলা শিল্প ও অন্যান্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলি। সওয়াই জয়সিং সমস্ত ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে সমান চোখে দেখতেন। সকলের জন্যেই তিনি প্রয়োজন মত মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন অথবা নির্মাণে সাহায্য করেছেন। রাজপরিবারের অন্য সদস্যরাও অনেকে আলাদাভাবে এবং বিত্তবান শেঠেরা তাদের নিজের পছন্দমত দেব-দেবীর মন্দির তৈরি করেছে। তাছাড়া শহর পত্তনের সময় যে ছ'টি গ্রামের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তার কোন স্থায়ী মন্দিরের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছিল। যতদূর সম্ভব সেই গ্রামীণ মন্দিরগুলিকে তাদের নিজেদের পুরানো জায়গাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। বহুক্ষেত্রেই তাই দেখা যায় কিছু কিছু প্রাচীন মন্দির বর্তমানে রাজপথের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছে। শহরের রাস্তা-গুলিকে সরলরেখার মত সোজা রাখার পরিকল্পনা অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়েই এমন পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করে নিতে হয়েছে। জয়পুরকে এক সুষম শিল্প সুন্দর শহর হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে জয়সিং বিশেষ যত্নশীল ছিলেন—তিনি শহরে নির্মীয়মাণ গৃহের উচ্চতা আকার এবং বাহ্যিক কারুকাজ কি ধরনের হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতেন। প্রথমের দিকে



প্রতিপত্তিশীল ঠাকুর, সর্দার এবং ধনী ব্যবসায়ীদের শহরে বসবাসে উৎসাহিত করতে জমি এবং ঋণ পাবার সুলভ ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু এতবেশি লোক এই সুবিধা গ্রহণ করতে শুরু করে যে অচিরেই ব্যবস্থাটিকে বন্ধ করে দিতে হয়।

মোটামুটি ভাবে জয়পুরকে সওয়াই জয়সিংয়ের শহর বলে ধরা হলেও জয়পুর আধুনিকীকরণ, সংস্কার ও পরিবর্ধনের কাজে সওয়াই রামসিং (১৮৩৫-১৮৮০ খৃঃ) দ্বিতীয়ের অবদানও সীমাহীন। তিনি জয়সিংয়ের আরদ্ধ কাজটিকে প্রায় একশো বছর বাদে শেষ করেছেন বললে অন্যায় হবে না। প্রাচীর বেষ্টিত শহরের সীমানার বাইরেও বহু উল্লেখযোগ্য এবং দর্শনীয় ভবন নির্মাণের কৃতিত্ব তার। তিনি শহরের বালুময় রাজপথগুলিতে পাথর বসিয়ে ফুটপাথের ব্যবস্থা করেন; তিনটি প্রধান চৌপড়ে ফোয়ারা বসিয়ে সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শহর থেকে ১৯ মাইল দূরে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামগড় বাঁধ তৈরি করে প্রায় একলক্ষ প্রজার পানীয় জলের প্রয়োজন দূর করেছিলেন। রাজপথে এবং শহরের বিশিষ্ট কিছু ভবনের জন্যে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থাও তারই সময়ে তৈরি। এছাড়া মেয়ো হসপিটাল (বর্তমানে সাঙ্গানের ডিসপেনসারি), রামবাগ ময়দান, রামবাগ প্রাসাদ, অ্যালবার্ট হল মিউজিয়াম, আর্ট স্কুল, সাধারণ পাঠাগার, নাট্যশালা (বর্তমানে রামপ্রকাশ সিনেমা) কলেজ, স্কুল ও রাস্তা প্রভৃতিও তিনি নির্মাণ করেছিলেন।

জয়পুর তার 'গোলাপী শহর' নামটির জন্যেও তার কাছে ঋণী। জয়সিংয়ের সময়ে শহরের অধিকাংশ ভবন এবং বাজারের রঙ সাদা ছিল। রামসিং বাজারগুলিকে সবুজ, হলদে, গোলাপী প্রভৃতি নানান রঙে রাঙিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে এক সময় গোলাপী রঙটি নির্বাচন করেছিলেন।

জয়পুরের প্রসঙ্গ এলেই স্বদেশে-বিদেশে যে পরিচিত ছবিটি সকলের আগে ভেসে ওঠে সেটি 'হাওয়া মহলের'। স্কুলের পাঠ্য বই থেকে নিয়ে ওয়েভারলির 'বুক অফ নলেজ' পর্যন্ত চালচিত্রের আকারে পাঁচতলা এই মহলটির ছবি আছে। জয়পুরের সবথেকে প্রসিদ্ধ এবং বিজ্ঞাপিত এই ঐতিহাসিক ভবনটি নির্মাণের কৃতিত্ব অবশ্য কবি ও শিল্পী রাজা সওয়াই প্রতাপ সিংয়ের (১৭৭৮-১৮০৩ খৃঃ)। ১৯৭৭ সালে শহরের ২৫০তম জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে হাওয়া মহলের ছবিটি প্রতীক চিহ্ন (সিম্বল) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

জয়পুর শহরের স্থাপত্য শিল্প ভারতীয় শিল্পকলার প্রচলিত শৈলী থেকে বিশেষ ভিন্ন ধরনের না হলেও তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সওয়াই জয়সিংয়ের নির্মিত ভবনগুলিতে একটি বিশুদ্ধ শিল্প-রুচিশীলতা, দীপ্ত বলিষ্ঠতা এবং অকপট সরলতা লক্ষ করা যায়। তিনি ঋজু ও সাধারণ ধাঁচের নির্মাণ পদ্ধতির বদলে খিলান বা আটচালার কাজকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বিশেষ আটচালার আকৃতির জন্যে তার সময়ে নির্মিত প্রাসাদ-ভবনকে সহজেই আলাদা করে সনাক্ত করা যায়। এছাড়া তার সময়ের নির্মাণ শিল্পে পাথরের কাজের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ ধরনের চুনের প্রয়োগ তৎকালীন ভারতের অন্য কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনে দেখতে পাওয়া যায় না। এই চুনের একটা বিশেষ গুণ হল এদিয়ে এমন হালকা ও সূক্ষ্ম ধরনের কাজ করা সম্ভব যা আধুনিক স্থাপত্য বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়ের বিষয়।

পশ্চিমী পর্যটকদের অনেকেই জয়পুরকে শাহজাহানাবাদের উন্নত সংস্করণ বলে মনে করেন আবার কেউ কেউ তাকে প্রাচ্যের প্যারিস, ভার্সেই এমন কি কনসটানটিন-পোল বলতেও দ্বিধা করেন না। আমরা তাদের কথা মেনে নিয়ে বলবো ভারতের পশ্চিম প্রান্তের এই ঐতিহাসিক শহরটি এক বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজার মহান স্বপ্নের সার্থকতার এবং এক প্রায় অজ্ঞাতনামা বাঙালী স্থপতির প্রতিভার অনুপম শিল্প নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় এবং ভ্রমণবিলাসীদের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ★

[নিবন্ধটি রচনায় ব্যাপারে ডঃ অশোক কুমার দাস, অধ্যক্ষ, মহারাজ সওয়াই মানসিং দ্বিতীয় মিউজিয়াম; শ্রী বি এল ধামা, প্রাক্তন অধীক্ষক, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ; পণ্ডিত শ্রী ঝাবরমল শর্মা ও শ্রী কে ডি ভার্মা রচিত পুস্তক ও নিবন্ধ এবং সরকারী পর্যটন বিভাগের প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে।]

দেশে দেশে

মালাগাসিতে ধানের জন্য লড়াই

বল্মীক

এখন ধান কাটার সময়। দক্ষিণে ফিয়ানাবানৎসোবা থেকে উত্তরের দিকে আনৎসিরাবে পর্যন্ত শুধু শোনা যাবে একই, একঘেয়ে অথচ সম্ভাবনাময় শব্দরাজি। সে শব্দ ধানকাটার, পাথুরে মাটির উপর দিয়ে ধানের আঁটি টেনে নিয়ে যাওয়ার এবং পাথরের পাটাতনের ওপর ধানছাড়ার। বলতে গেলে মালাগাসি প্রজাতন্ত্র এখন ধানের শব্দে বুঁদ হয়ে আছে।

মাদাগাসকার দ্বীপ মালাগাসি প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তম অংশ। এই দ্বীপেই ধানচাষ হয় সবচেয়ে বেশি। দ্বীপটি পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ। আফরিকার দক্ষিণপূর্বে ভারত মহাসাগরের উপর মহাদেশ থেকে আলাদা হয়ে আছে যে একাকী দ্বীপটি তারই নাম মাদাগাসকার।

দ্বীপকে দুভাগে ভাগ করা যায়। নিচের দিকে শুধু ধান আর ধান। ফিয়ানাবানৎসোবা থেকে আনৎসিরাব পর্যন্ত হাইওয়ে আছে টানা। মোটরে এই রাস্তা পেরোতে লাগে নব্বই মিনিটের মত। আনৎসিরাব পেরোলেই শুরু হয়ে যায় পশুপালনের অংশ। আনৎসিরাব মাদাগাসকার স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জায়গা। এই ছোট্ট শহর দিয়েই মানুষের জীবিকা ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে।

ধানের মত পশুপালনও উল্লেখযোগ্য। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীতে গোপালনে সবচেয়ে উন্নত দেশ হচ্ছে অসট্রেলিয়া। মালাগাসি প্রজাতন্ত্র এখন সেই অসট্রেলিয়াকেও গোপালনে ছু'তে চলেছে।

মালাগাসি প্রজাতন্ত্রকে বলা হয় 'দ্যল্যানড অব দ্য লিভিং ফসিলস'। এ দেশে এমন গাছ, এমন সব প্রাণী আছে পাখি ও কীটপতঙ্গ আছে যা পৃথিবী থেকে অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন 'লেমুর'। বাঁদর ও কাঠবিড়ালির সংমিশ্রণ এই কিম্ভূত প্রাণীটি সে দেশে সংরক্ষিত হচ্ছে সরকারি ভাবে। তবে তার দরকারও হয় না। কারণ মালাগাসির লোকেরা বিশ্বাস করে লেমুর খুব পবিত্র জীব, ওদের মধ্যেই মৃতের আত্মা বেঁচে থাকে।

প্রবাদকে মালাগাসি ভাষায় বলে হেইনতেনি। বুড়োদের সেখানে খুব সম্মান। কারণ হেইনতেনি তাদের মতো কেআর হাবারি করতে পারে? হাবারি মানে জনসমক্ষে গপ্পগুজব করা।

এইরকম চালু দুটি হেইনতেনি হল : যে ধান বোনে না সে আবার চাষা কিসে? আর একটা : যে লোকটা চাল খায়নি সে মালাগাসিই নয়।

প্রবাদদুটো থেকেই বোঝা যাবে ধান ও চাল মালাগাসিদের জীবনে কতখানি প্রয়োজনীয়। অথচ মজার ব্যাপার, সৃষ্টির আদিকাল থেকে এখানে ধানচাষ হত না। এদেশের ওপর দিয়ে নানা সময়ে বহু বণিকের আবির্ভাব ঘটেছে। দশম শতাব্দীতে আরব বণিকরা যখন সমুদ্র অঞ্চল চষে বেড়াত তখন এখানেও পা দিয়েছিল। ভাসকো দা গামাকে ধরে তারা এখানেই নিয়ে আসে, পরে ছেড়ে দেয়। পাঁচশো বছর পরে দিয়োগো দিয়াস নামে এক পরতুগীজ ক্যাপটেন এখানে ঢুকে পড়ে। তার কিছু আগে ভারতীয় বা চীনে বণিকদেরও এখানে আসার কথা কেউ উড়িয়ে দেন না। সম্ভবত তাদেরই কেউ ধানচাষের কায়দাকানুন সঙ্গে নিয়ে আসে।

মালাগাসিদের নিজস্ব রাজত্ব ছিল ষোড়শ শতকে। পরে ফরাসিরা এদেশ দখল করে নেয়। ১৯৬০ সালে মালাগাসি স্বাধীন হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর সংবিধানের মধ্য দিয়ে দেশে একজন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। তার কার্যকালের মেয়াদ ছিল সাত বছর। কিন্তু সংবিধানের এই ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার কারণ অবশ্য ঐ ধানই।

দেশের আশি শতাংশ মানুষ ধান চাষ করে জীবিকা চালায়। দেশে যত শস্য উৎপন্ন হয় তার চল্লিশ শতাংশ আসে ঐ ধান থেকেই। এবং ধানের জমির ৯৫ শতাংশ সেচযুক্ত। আলায়োত্রা হ্রদের জল থেকেই সেচের জল আসে। ধান রফতানি করে মালাগাসি বিপুল পরিমাণ টাকা রোজগার করত। তাদের ধান রফতানিতে বিদেশী কোমপানি কাসাভার পাঁউরুটি রফতানি অনেক কমে গেল। তখন মালাগাসি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ৎসিরাজানা। তিনি বিদেশি কোমপানির স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধানের দাম কমিয়ে ফতোয়া জারি করলেন। ফলে ধানচাষ অলাভজনক হয়ে পড়ল। আবার একেবারে দক্ষিণ দিকে শস্য বলতে বিশেষ কিছু হয় না।

ৎসিরাজানার সবজান্তা আমলারা তখন ধানচাষীদের অন্যকিছু চাষ করার জন্য জোরাজুরি করতে শুরু করে। তাতে কেউ কেউ বাধ্য হয়ে অন্য চাষ শুরু করে। কিন্তু ফল যা ঘটবার তাই-ই ঘটল অর্থাৎ রফতানিকারক দেশ মালাগাসি ধানচাল আমদানি করতে বাধ্য হল। যে অনায়াসে পেট ভরে খেতে পেত তার ভাগ্যে অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল ক্ষুধার জ্বালা। এই ক্ষুধাই মালাগাসিদের বাধ্য করল ৎসিরাজানার বিরুদ্ধে একজোট হতে। ধানচাষী ও সাধারণ মালাগাসিদের প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াতে না পেরে রাষ্ট্রপ্রধান ৎসিরাজানা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

১৯৭২ সালে এই পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গণভোট নেওয়া হল। শুরু হল নতুন পদযাত্রা। মালাগাসি প্রজাতন্ত্রের ধান চাষীরা আবার যথারীতি চাষবাস শুরু করে দিল। গণভোটের পর ঠিক হল লাঙল যার জমি তার নীতি গ্রহণ করা হবে। ১৯৭৫ সালে গৃহীত এই নীতি এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি তবে ধান উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়েছে।

দেশে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫ লক্ষ হেকটরের মত। এই বিশাল জমিকে একটা নীতির মধ্যে আনার জন্য সমবায় ফারম তৈরির সূচনা হল। তাছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বেশি জমিকে ভাগ করে চাষীদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু এই নীতিতে বাগড়া দেবার লোকের অভাব নেই। বেতাসিলিও এবং মেরিনা উপজাতির লোকেরা ধান চষে না। শিহানাকারা উপজাতিরাই এ কাজ করে। তাদের সংখ্যা ধানচাষ অঞ্চলে ২ লক্ষ। এই ভিন্ন ভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে বিরোধ বাধাবার চেষ্টা হচ্ছে।

মালাগাসিরা এই বিরোধ যাতে মাথা চাড়া না দেয় এবং দেশের উন্নতিতে যাতে বাধা না হয় তার জন্য নতুন এক বিপ্লব শুরু করেছেন। এই বিপ্লবের নাম 'ধানের জন্য যুদ্ধ'। সাধারণ মানুষের এই নামকরণ সরকারও মেনে নিয়েছে। কারণ সরকারও জানে মালাগাসির মাথার উপরে জ্বলছে একটিই 'দিনের চোখ'। ফলে মালাগাসি ঐক্যবদ্ধ থাকতে বাধ্য। সূর্যকে মালাগাসি প্রবাদে বলে 'দিনের চোখ'। এটাও সেখানে খুব প্রিয় একটা হেইনতেনি। ★

চতুর্থ আন্তর্জাতিক বইমেলা

আগামী ২৯ ফেবরুয়ারি থেকে নয়া দিল্লিতে প্রগতি ময়দানের হল অব ন্যাশনাল কমপ্লেকসে শুরু হতে যাচ্ছে চতুর্থ আন্তর্জাতিক বইমেলা। এর উদ্যোক্তা ন্যাশনাল বুক ট্রাসট। চলবে ৯ মারচ পর্যন্ত।

ভারতীয় বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির প্রকাশনা-সংস্থা সহ প্রায় ৪০০ প্রতিষ্ঠান যোগ দিচ্ছেন। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বিপুল সংখ্যক বই-এর জন্য তাই থাকছে 'ভারতীয় ভাষাওঁ কা মণ্ডপ' নামে আলাদা বিভাগ। সেই সঙ্গে দেখেশুনে বই কেনার জন্য থাকছে বইবাজার। এছাড়া শিশুদের বই, ভারতীয় বই-এর পেপারব্যাক এবং সদ্যসাক্ষরদের জন্য বইতো থাকছেই।

বইমেলার সঙ্গে সঙ্গে চলবে সেমিনার, সিমপোজিয়াম, ওয়ারকশপ। ইউনেসকোর সহযোগিতায় আলোচনা বসবে 'উন্নয়নকামী দেশসমূহের গ্রামাঞ্চলে পুস্তক প্রকাশনা' নিয়ে।

কলকাতার অতিথি

ডানসটান ডি সিলভা

সন্ধানী

ইনডিয়ান কাউনসিল ফর কালচারাল রিলেশনস এর আমন্ত্রণে কিছুদিন আগে কলকাতা ঘুরে গেলেন শ্রীলংকার এক জনপ্রিয় মানুষ ডানসটান ডি সিলভা। স্বদেশের সঙ্গীত জগতের প্রায় এক নমবর মানুষ তিনি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। দেখলে মনে হয় চল্লিশও হয়নি বুঝি।

জন্মেছিলেন দক্ষিণ সিংহলের সমুদ্রের জলে স্নান করানো সবুজ গ্রাম ওয়ালিগামায়। ছোটবেলা থেকেই ডানসটানের হাতে থাকত বাঁশি। বুকের বাতাসে সুর তুলতেন, ঘুরে বেড়াতেন পাহাড়ের আলোছায়ায়। শুধু বাঁশি বাজানো না, মাটি দিয়ে সুন্দর পুতুল তৈরি করতেও পারত কিশোর ডানসটান।

কলেজে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা পাবার পর হঠাৎ যেন ভেতরের সেই সুর গলায় এসে বাজল। গানের তালিম নিতে চলে এলেন লখনউয়ে। ভাতখণ্ডে লখনউ তখন ক্লাসিকাল গানের মক্কা। ১৯৪৪ থেকে ৫২ আটবছর রেওয়াজের পর ভারতীয় সঙ্গীতে 'সঙ্গীত বিশারদ' পদবীটি নিয়ে ডানসটান ফিরে গেলেন শ্রীলংকায়।

দু বছর বাদেই রেডিও সিংহল থেকে সিনিয়র মিউজিক অ্যাসিসট্যানটের কাজ।

এমনিতে সিংহলের নিজস্ব কোন ঐতিহ্য নেই ক্লাসিকাল সংগীতের। লোকগীতি ও পুরাতনী গানই তাদের একমাত্র সম্পদ। ডানসটান পুরাতনী লোকগীতির সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের সমন্বয় ঘটালেন। নতুন কমপোজিশন তৈরি হল। রেডিও সিংহল থেকে প্রচারিত হতে শুরু করল নতুন সিংহলীগান। সুরের যাদুকর ডঃ লায়নেল ইদারিসিংগাহর দেশে এক তরুণ সিংহলী নিয়ে এলেন নতুনতর ভাবনা। গানের সুরে এল সবুজ হাওয়া। সরকারী অনুমোদন ও স্বীকৃতি পেলেন তিনি। আর সিংহলী সংগীত পেল এক নতুন প্রতিভাকে।

একটানা একুশ বছর ছিলেন তিনি ঐ পদে। সিংহলী গানের আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন এলো। পার্ক হোটেলের ঘরে বসে কলকাতার অতিথি ডি সিলভা বলছিলেন তার দেশের গানের কথা। ভারতীয় রাগ সংগীতই নাকি সিংহলী গানের ভিত। এখনও বেশ কিছু ছাত্র ভারতের বিভিন্ন শহরে আসেন গান শিখতে। ভারতীয় সংগীতের ওপর সিংহলীদের দুর্বলতা অবশ্য আজকের নয়। তিনি বললেন 'প্রায় একশ বছর আগে ভারতীয় সংগীতকাররা আমাদের দেশে গিয়ে অপেরার গানে সুর দিতেন, যাকে আমরা নূর্তি গান বলি। আমাদের পুরাতনী গানের ঐতিহ্য বোধ হয় তখন থেকেই শুরু। তাছাড়া আমাদের নাটক হচ্ছে দু ধরনের, কানডিয়ান (পাহাড়ি এলাকার) ও রুহুনু (নীচু সমতল এলাকার)। এই দু ধরনের নাটকেই লোকগীতির ব্যবহার স্পষ্ট। নাচে অবশ্য দক্ষিণ ভারতের প্রভাবটাই বেশি।

আজকের শ্রোতাদের সম্পর্কে ডি সিলভার মন্তব্য 'খুব হালকা গান সিংহলীরা মোটেই পছন্দ করে না। ধার করা পপ সংগীত জনপ্রিয় হলেও জীবনের গভীরে সেগুলো প্রবেশ করেনি। আমরা এখনও ঐতিহ্যবাহী, জাতীয়তাবাদী'।

সিরিমাভো বন্দরনায়েকের মন্ত্রিসভার সময় ডানসটানের ডাক পড়েছিল শিক্ষামন্ত্রকে প্রধান সংগীত শিক্ষকের। সে দায়িত্বও তিনি তিনবছর যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ১৯৭৮ এর নভেমবরে আবার ডি সিলভা ফিরে এসেছেন বেতার দফতরে, আকাশবাণী সিংহলের ডেপুটি ডাইরেকটর হয়ে। এখন তিনি সেখানকার সিংহলী সংগীতের প্রধান।

ভারত ভ্রমণের কারণ সম্পর্কে বললেন—'দুদেশের প্রতিভা বিনিময়ের কথা ভাবছি আমি'। সরকারী ও বেসরকারী দুভাবেই তিনি রাজি। রবিশংকর তার সুহৃদ, সিংহলে নিয়ে তাকে দিয়ে অনুষ্ঠান করিয়েছেন। আলি আকবর, শুভলক্ষ্মী একাধিকবার গেছেন শ্রীলংকায়। একবার সুচিত্রা মিত্র গিয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানই শোনাননি, সিংহলী গানও শুনিয়ে এসেছেন সিংহলীদের। ডানসটানের সৌভাগ্য রবিঠাকুরের সিংহল সফরের সময় কবিকে নিজের চোখে দেখেছেন। রবিঠাকুরের গান তার প্রাণের স্পন্দন।

ডানসটান বললেন—'ভৌগোলিক দিকে আমরা তামিলনাড়ুর কাছাকাছি হলেও, সংস্কৃতির ব্যাপারে বাংলাদেশের সংগে নাড়ির যোগ রয়েছে আমাদের'।

বিজয় সিংহর লঙ্কা জয়ের সেই ঐতিহাসিক সময় থেকেই সংস্কৃতির বিনিময় ঘটেছে বাংলার সঙ্গে সিংহলের। ভাদু-টুসু ভাটিয়ালির টান তাই খুঁজে পাওয়া যায় সিংহলী রাখালের বাঁশিতে, বিয়ের গানে কিংবা পেরিজের ছবির কোন খণ্ড দৃশ্যে। ডি সিলভা কলকাতায় ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের অনুষ্ঠান দেখেছেন, আকাশবাণীর কালান্দার সাহেবের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছে। উদ্দেশ্য—প্রতিভা বিনিময়।

জানি না তার প্রচেষ্টা কতখানি সফল হবে, কিন্তু হোটেলের বাইরে বেরিয়ে বার বার কানে বাজছে একটা কথা 'কালচারাল উই আর ক্লোজেস্ট টু বেঙ্গল।' ★

নাট্য-সমীক্ষা

অশ্বমেধ

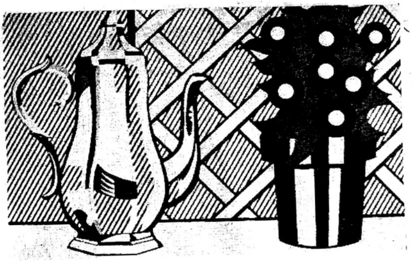
প্রযোজনা: প্রোফাইল। রচনা নির্দেশনা: বিদ্যুৎ নাগ। মঞ্চ পরিকল্পনা: ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণজিৎ চক্রবর্তী। আলো/পরিকল্পনা: আশীষ দত্ত। নিয়ন্ত্রণ: গোপাল দাস। স্বর/আবহ: দেবাশিস দাশগুপ্ত। কণ্ঠসঙ্গীত: শক্তি ঠাকুর। অভিনয়: ৩১ ডিসেমবর ১৯৭৯, একাডেমী।

'দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধের ঘোড়া যখন আস্তাবলে ফেরে, তাকে বলি দিয়েই যজ্ঞ করা হয়'। অবক্ষয়ী দলীয় রাজনীতি অ্যাডভেনচারপ্রিয় তাজা যৌবনগুলোকে নিংড়ে রাজনীতির দাবা খেলে, আর তাদের এ বিলাসে পুড়ে খাক হয় নিম্নবিত্তের সংসার। 'তবুও তো কামারশালায় গনগনে লাল লোহায় হাতুড়ির ঘা পড়ে—জন্ম নিতে চায় একটা নতুন পাত্র।' রাজনীতি আর মস্তান নিয়ে এ যাবত অনেক নাটক হল, কিন্তু শিল্পসম্মতভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার স্তরে অপচয়িত যৌবনের রিয়্যালাইজেশনের কথা বলার ক্ষেত্রে প্রোফাইলের এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রম প্রযোজনা।

নাটক, নির্দেশনা এবং অভিনয়—প্রোফাইল এই তিনটি বিষয়েই ধনী। বিদ্যুৎ নাগের স্বচ্ছ সুঠাম লেখনীর চাতুর্য যেমন ঋজু তীরের মত সোজাসুজি বেঁধে, তেমনি তার বুদ্ধিদীপ্ত নির্দেশনার অনুপম নৈপুণ্যে আমরা মুগ্ধ হই। তার সচেতন পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জহর কয়াল, দেবাশীষ দত্ত, অভিজিৎ বর্ধন, রবিশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখের স্বাভাবিক অভিনয়ের পাশাপাশি পৃথ্বীশ মিত্রের টাইপ অভিনয়, আশীষ দত্তের স্টাইলাইজড অভিনয় এবং তার নিজের টাইপ-মিশ্রিত স্বাভাবিক অভিনয়—সবগুলি মিলে একটি যৌগিক আবহ সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎবাবুর 'বাবা বিশুদা' সম্বোধনটি প্রথমবার প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল তোলে, আবার পরিবর্তিত নাট্য মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিপরীত মোচড় দেয়। স্ত্রীচরিত্র দুটিতে পাপড়ি বসু ও ছায়া ঘোষ অনবদ্য।

প্রযোজনার সাফল্যের অনেকখানি অংশীদার মঞ্চ পরিকল্পনা এবং সঙ্গীতের মুনসিয়ানা। অশ্বমেধের মঞ্চ নতুনতর চিন্তার ফসল। কিন্তু দু'টি নাট্য সন্ধিক্ষণে সেট পরিবর্তনে সময় সংক্ষেপ করার পথ খুঁজে বার করতে হবে। শম্ভু মিত্র ও সলিল চৌধুরীর আবৃত্তি বা ছোটদের খেলনা বেহালার ভাঙা সুর আবহের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক। তবু অভিযোগ: আবহ কিছুটা সোচ্চার—নিয়ন্ত্রণ এবং চরিত্রেও। আলো সাধারণ স্তরের। ★

বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী



স্টিল লাইফ উইথ পিচার অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স— রয় লিচেনস্টাইন

চিত্র-প্রদর্শনী

শুধুই রূপ

আমেরিকান সেনটারের উদ্যোগে কলকাতার যাদুঘরে আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে মার্কিনী পপ আর্টের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। শিল্পী ছিলেন রয় লিচেন-স্টিন, ক্লেস ওলডেনবুর্গ, জেমস রোজেন কুইস্ট এবং এ্যাণ্ডি ওয়ারহল। চার শিল্পীই সাম্প্রতিক পপ আর্টের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত নাম।

পপ আর্ট সমকালীন চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমাদের দেশে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেনি; তবে বিচ্ছিন্নভাবে এর কিছু প্রভাব ইতোমধ্যেই আমরা অনেক তরুণ শিল্পীর কাজেই লক্ষ করছি। পপ আর্টের ক্ষেত্রে ক্যানভাসে শুধু-মাত্র রেখা কিংবা রঙেই ছবি সীমাবদ্ধ থাকে না। কোলাজ রীতির সীমাও কখনো কখনো লঙ্ঘিত হয়। বস্তুকে কি ভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরেই নির্ভর করছে শিল্প হওয়া, না হওয়া। যেমন মার্কিন সমালোচক নাইজেল গস্লিং-এর মতে 'একটি টেবিল যতক্ষণ আর্টগ্যালারিতে আর্ট হিসেবে প্রদর্শন করা হচ্ছে—ততক্ষণ তা আর্ট। কিন্তু আর্টটি কি দর্শটি ঐ রকম টেবিল সাজিয়ে রাখলে ঐ গ্যালারি তখন আর আর্ট গ্যালারি থাকবে না, হয়ে যাবে রেস্তোরাঁ'।

এই চারজন শিল্পী কিন্তু এই বিতর্কের মধ্যে পড়েন না। অন্তত তাদের প্রদর্শনীতে এমন কোন শিল্প-কর্ম ছিল না যা দেখে সাধারণ দর্শক বিস্মিত হবেন। চার শিল্পীই মূলত প্রচার শিল্পের পেশায় যুক্ত ছিলেন। এ্যাণ্ডি ওয়ারহল বাদে বাকি তিন জনের কাজেই প্রচার শিল্পের নিয়ম নির্দিষ্ট ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। রয় লিচেনস্টিনের কাজে রঙ ছাড়াও ধাতব পাত ব্যবহারে চোখকে কিছুটা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা রয়েছে। চড়া রঙ ব্যবহারে অবশ্যই মুনসিয়ানা আছে, চোখ ধাঁধানো মায়াবী খেলা। ওলডেনবুর্গ বা রোজেনকুইস্ট সম্পর্কেও একথা বলা চলে। তবে এই তিন জনের শিল্পকর্ম মূলত রঙের নানান ঘেরাটোপের সাহায্যে বিভিন্ন নকশা হয়ে উঠেছে। এই বিচিত্র বর্ণ সুষমা আমাদের নিছক রূপে ভোলালেও হৃদয়ে কোন ব্যাপক আবেদন রাখে না; শুধুমাত্র বর্ণ ব্যবহারের যান্ত্রিকতায় ক্ষণিক চমক লাগায়। একমাত্র ব্যতিক্রম এ্যাণ্ডিওয়ারহলের ফ্লাওয়ার প্রিনট-গুলি। কালো রেখার মধ্যে স্বচ্ছ রঙের ব্যবহার অনেক বেশি স্পর্শাতুর; অনেক বেশি আপন।

সমীর ঘোষ

বিচিত্র সম্ভার

আকাডেমির বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী (ডিসেমবর-জানুয়ারি) পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাংস্কৃতিক উদ্যোগ। কিন্তু শিল্প-কর্ম নির্বাচনের ব্যাপারে সৌজন্য ও উদারতার চেয়ে নির্বাচিত দর্শনীয়গুলির উৎকর্ষ সম্পর্কে সচেতন হলে প্রদর্শনীটি আরো উপভোগ্য হতো। প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে দিললি, বোমবাই, মাদ্রাজ, বারানসী, হায়দ্রাবাদ, ভুপাল, বরোদা, রাজকোট, ইন্দোর ও অন্যান্য স্থানের শিল্পীদের তেল ও জলরঙের চিত্র, স্কেচ, ড্রইং গ্রাফিকস, ভাস্কর্যে,ব্রোনজ, সিমেনট মারবেল পাথর ও কাঠের অসংখ্য কাজ ছিল।

তত্ত্বকথা নীরস ও ধূসর, জীবনের বৃক্ষটি সবুজ ও সরস—এই সার সত্যটি অমিত বোস বুঝে ফেলেছেন। কিন্তু এসেনস অব লাইফ (তেলরঙ) এর রঙের জেল্লাস বড়ো বেশি। সূর্য, সবুজ বনানী ও যৌন আশ্লেষের লুকো-চার। ভাবনার মেঘগুলো এখনো দেখা দেয়নি।

গোপাল ঘোষের ল্যানডস্কেপ হলুদ রঙের চত্বরে কৃষ্ণবর্ণ কাণ্ড ও ঘন সবুজ পাতার দুটি গাছ। একটি আশ্চর্য ছবি। শানু লাহিড়ীর 'আর্টিসট' পরিমিতি স্বাচ্ছন্দ্য ও বর্ণরুচির নিদর্শন। সমকালীন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুটি চিত্রের উল্লেখ করা প্রয়োজন, একটি রথীন মৈত্রের 'ডেসটিটিউটস' অপরটি পি শ্রীনিবাসনের 'ফ্লাড'। হালকা সবুজ রঙে আঁকা শ্রীনিবাসনের চিত্রে বন্যার বিধ্বংসী রূপটি ধরা পড়েনি। মনে হয় ঢেউগুলি যেন জলের আলপনা। রথীন মৈত্রের ভিক্ষার্থী পরিবারের দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গের পথচারী মানুষের অতি পরিচিত।

হরিশ রাউথ-এর 'এ্যাওয়েটিং' কুঁড়েঘরের দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে সুন্দরী যুবতী। সবুজ ঘাগরা, কমলারঙের ব্লাউজ, হলুদ ওড়না। অনাবৃত অঙ্গ দেখলে মনে হয় ত্বক মসৃণ ও আর্দ্র রাখার আধুনিক প্রসাধন



'কম্পোজিশান' — চিন্ময় কুন্ডু

রহস্যটি জানা আছে, আরম-পিট ডিওডারেনট স্প্রে করা! না, কুঁড়েঘরের সামনে এ তরুণীকে মানায় না। এ শুধু অলস মায়া।

বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ভাস্কর্য কিছু দেখা গেল না। শিমূল ঘোষের 'ওয়েট লিফটার' মন্দ নয়। সুশান্ত রায়ের কাঠের কাজ 'ডিং কিং' হেনরি মুর-এর অনুকরণ। রমেশ পাল, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও বিপুল সাহার সিমেনট, কাঠ ও প্লাসটারের কাজের মধ্যে মামুলী আসঙ্গলিপ্সা ব্যক্ত হয়েছে।

প্রণব নাগ

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), হইতে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯) হইতে প্রকাশিত


এক চক্ষু জলদস্যু
মূল কাহিনী ঃ রবিদাস সাহারায়
চিত্র কাহিনী ঃ অলোক দত্ত
শিল্পী ঃ পোলারিস
১০
হাঁহাঁ হিঁহিঁ
একসময় ওদের ছুঁড়ে দেওয়া হল 'টেরর' জাহাজের ডেকে ।
রোজ এবং নেডের তখন জ্ঞান নেই ।
কিছু পরে নেডের জ্ঞান ফিরে এল । সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা ।
হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নেড চারদিকটা দেখে নিল । একটু দূরে রোজ পড়ে আছে । ওকে বাঁধা হয়নি ।
সূর্য তখন অস্ত যায় যায় । সমুদ্রের জল লাল । জলদস্যুরা মনের আনন্দে 'সুসান ডেয়ারে' লুটপাট করে চলেছে ।

(ক্রমশঃ)

16 February 1980. Registrati PoPostal Registratra. No. WB/CC—380. Rs. 1.50



দিলীপ ব্যানারজি